Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা জেরিন

রোলঃ 23100121700

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারজানা জেরিন

রোলঃ 23100121700

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারজানা জেরিন, আইডিঃ 23100121700 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ কবরের জীবন ও আমাদের প্রস্তুতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফারজানা জেরিন

আইডিঃ 23100121700

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

কবরের জীবনের স্বরূপ ও পরিচয় (বারযাখী জীবন):..9

মৃত্যুর মুহূর্ত ও রূহ কবজের প্রক্রিয়া: 30

সালাফদের দৃষ্টিতে কবরের জীবন: 41

কবরে প্রবেশের প্রথম রাত ও কবরের সংকীর্ণতা...49

মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব:..56

কবরের আরাম ও নেয়ামতসমূহ:...65

কবরের আজাব ও এর কারণসমূহ: 76

কবরের আজাব থেকে মুক্তির উপায়: 92

মৃত্যুর স্মরণে আত্মশুদ্ধি :..103

পার্থিব জীবনে আখিরাতের প্রস্তুতির রূপরেখা: 111

সদকায়ে জারিয়া ও কবরে এর প্রভাব: 117

অসিয়ত ও হক আদায়:..120

আধুনিক বস্তুবাদ বনাম কবরের বাস্তবতা:...123

উপসংহার ও সমাজ গঠনে পরকালভীতির ভূমিকা: 125

প্রারম্ভিক আলোচনা

এই সুবিশাল পৃথিবী হলো মূলত মানুষের জন্য এক বিশাল কর্মশালা বা পরীক্ষার হল, আর মৃত্যু হলো সেই কর্মশালা থেকে নিজের আসল ও চূড়ান্ত গন্তব্যে ফিরে যাওয়ার এক প্রধান প্রবেশদ্বার। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে দুনিয়াতে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া পাঠাননি; তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেবলই তাঁর ইবাদত ও দাসত্বের জন্য। আমরা চোখের সামনে যে দুনিয়ার জীবনকে এত সাজাতে ব্যস্ত থাকি, এই জীবনটা কিন্তু চিরস্থায়ী নয়। এটি আসলে আখিরাত বা পরকালের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ— অর্থাৎ এখানে বান্দা যেমন বীজ রোপণ করবে, পরকালে সে ঠিক তেমনই ফসল কাটবে।

মানুষের এই দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত দীর্ঘ সফরের প্রধানত তিনটি পর্যায় বা ধাপ রয়েছে: প্রথমটি হলো আমাদের এই বর্তমান দুনিয়ার জীবন, দ্বিতীয়টি হলো 'বারযাখ' বা কবরের জীবন, আর তৃতীয় ও শেষ ধাপটি হলো হাশরের ময়দান এবং চিরন্তন পরকাল। আমাদের এই পুরো থিসিস বা গবেষণার মূল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হলো দ্বিতীয় ধাপটি, অর্থাৎ 'বারযাখ' বা কবরের জীবন, যাকে আমরা পরকালের সর্বপ্রথম মঞ্জিল বা স্টেশন বলে থাকি।

মহাবিশ্বের প্রতিটি প্রাণীর জন্য মৃত্যুই হলো সবচেয়ে বড় এবং অমোঘ সত্য। পৃথিবীর বিজ্ঞান, উন্নত দর্শন, অগাধ অর্থ বা কোনো রাজকীয় শক্তিই আজ পর্যন্ত মৃত্যুকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে পারেনি এবং পারবেও না।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এই সত্যটি ঘোষণা করে বলেন:
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
অনুবাদ: "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের পূর্ণ প্রতিদান বা কাজের হিসাব বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"
(সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৮৫)।

এই আয়াতটি আমাদের মনের ভেতর এই চেতনা জাগিয়ে দেয় যে, মৃত্যু মানেই জীবনের সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়; বরং মৃত্যু হলো দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন এবং অনন্ত জীবনের শুরু মাত্র।

কবরের জীবনের গুরুত্ব কতটা ভয়াবহ এবং গভীর, তা আমরা আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর একজন প্রখ্যাত সাহাবী ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান জিন্নুরাইন (রা.)-এর জীবনের একটি বাস্তব ঘটনা থেকে খুব সহজে বুঝতে পারি। ইসলামের ইতিহাসে এসেছে, হযরত উসমান (রা.) যখনই কোনো সাধারণ কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন, তখন তিনি এত বেশি কাঁদতেন যে তাঁর চোখের পানিতে তাঁর পুরো দাড়ি মোবারক ভিজে যেত।

একদিন তাঁর এই অবস্থা দেখে আশেপাশের মানুষজন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূলের সহচর! জান্নাত ও জাহান্নামের মতো বড় বড় এবং ভয়ানক বিষয়ে যখন আলোচনা হয়, তখন তো আপনি এত বেশি কাঁদেন না। কিন্তু এই সাধারণ মাটির কবরের কথা মনে করে আপনি কেন এত বেশি কাঁদছেন?"

তখন হযরত উসমান (রা.) এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, আমি নিজের মন থেকে কাঁদছি না, বরং আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে নিজে বলতে শুনেছি: "মাটির নিচের এই কবর হলো মূলত পরকালের অনন্ত সফরের সর্বপ্রথম মঞ্জিল । যে মানুষটি এই প্রথম স্টেশনেই আল্লাহর রহমতে ফেরেশতাদের সওয়াল-জওয়াবে পাস করে মুক্তি পেয়ে যাবে, তার জন্য এর পরবর্তী হাশর, মিজান আর পুলসিরাতের সমস্ত ধাপগুলো একদম সহজ হয়ে যাবে। আর আফসোস, যে ব্যক্তি এই প্রথম স্টেশনেই আটকা পড়ে যাবে এবং মুক্তি পাবে না, তার জন্য পরের ধাপগুলো আরও অনেক বেশি কঠিন এবং মারাত্মক হয়ে যাবে।"

(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ২৩০৮; মুসনাদে আহমাদ)।

সাহাবীর এই কান্না আমাদের চোখ খুলে দেয় যে, যে কবরকে আমরা কেবল মাটির স্তূপ ভাবি, তা আসলে পরকালের পাস-ফেলের প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র।

কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী, মৃত্যুর ঠিক শেষ মুহূর্তে একজন ভালো মানুষ (মুমিন) এবং একজন পাপিষ্ঠ বা কাফির ব্যক্তির রূহ বা আত্মা শরীর থেকে বের করে নেওয়ার দৃশ্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীত হবে।

১. মুমিন ব্যক্তির বিদায়

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, একজন মুমিন বা ভালো বান্দার যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন আকাশ থেকে রহমতের ফেরেশতারা অত্যন্ত নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে তার সামনে এসে উপস্থিত হন। ওই ফেরেশতাদের চেহারা হয় সূর্যের মতো উজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময়। তারা এসে ওই মুমিন বান্দাকে আল্লাহর ক্ষমা এবং জান্নাতের চমৎকার সুসংবাদ দিতে থাকেন। ফলে মৃত্যুর ভয়ে মুমিন বান্দা ঘাবড়ে যায় না। এরপর তার রূহটি শরীর থেকে এত সহজে এবং আলতো করে বেরিয়ে আসে, যেমন একটা পানির মশক বা কলসি কাত করলে তার মুখ থেকে পানির ফোঁটা অনায়াসে গড়িয়ে পড়ে।
মুমিনের এই সুন্দর মৃত্যুর দৃশ্য ফুটিয়ে তুলে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:
الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
অনুবাদ: "ফেরেশতারা যখন পবিত্র থাকা অবস্থায় তাদের (মুমিনদের) জান কবজ করেন, তখন ফেরেশতারা অত্যন্ত মমতায় বলেন: তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক! দুনিয়াতে তোমরা যে ভালো কাজ করতে, তার প্রতিদানে আজ তোমরা পরম সুখে জান্নাতে প্রবেশ করো।"
(সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩২)।

২. পাপিষ্ঠ ব্যক্তির বিদায়

পক্ষান্তরে, একজন পাপিষ্ঠ, অবাধ্য বা কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর সময় আকাশ থেকে কালো চেহারার অত্যন্ত ভয়ানক ও উগ্র আজাবের ফেরেশতারা লাঠি ও চাবুক নিয়ে আগমন করেন। তার রূহ বা আত্মাটি কবরের আজাবের ভয়ে শরীরের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে বেড়ায়। তখন ফেরেশতারা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে, টেনেহিঁচড়ে জোরপূর্বক তার রূহকে শরীর থেকে ছিঁড়ে বের করে আনেন, ঠিক যেভাবে ভেজা পশমের ভেতর থেকে লোহার কাঁটাযুক্ত শিক টেনে বের করা হয়।

পাপিষ্ঠদের এই যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর কথা কুরআনে এভাবে এসেছে:
"ফেরেশতারা যখন কাফির ও পাপিষ্ঠদের প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের সেই ভয়ানক অবস্থা যদি তুমি দেখতে পেতে! ফেরেশতারা তাদের মুখে ও পিঠে ক্রমাগত আঘাত করতে করতে বলবে—আজ দুনিয়া ছাড়ার দিন, এবার তোমরা দহন যন্ত্রণার কঠিন স্বাদ গ্রহণ করো।"
(সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৫০)।

মৃত্যুর এই প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার পর, মুমিন ব্যক্তির রূহকে ফেরেশতারা পরম সম্মানের সাথে নূরের কাপড়ে জড়িয়ে সপ্তম আসমানের ওপর 'ইল্লিয়্যিন'-এ নিয়ে যান এবং আল্লাহর আদেশে তার আমলনামা সেখানে মর্যাদার সাথে লিপিবদ্ধ করা হয়।

আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তির রূহকে যখন ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আসমানের ফেরেশতারা দুর্গন্ধের কারণে আসমানের দরজা খোলেন না, বরং সেখান থেকেই তাকে ধিক্কার দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তার স্থান হয় মাটির নিচের অন্ধকার কয়েদখানা 'সিজ্জিন'-এ।
এই থিসিসে আমরা মৃত্যু পরবর্তী জীবন এবং আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো, মৃত্যুর পর একজন মৃত ব্যক্তির কবরের জীবন কেমন হবে তা থেকে নিয়ে আমরা কিভাবে আমাদের মৃত্যু পরবর্তী জীবন কে দুনিয়াতে বেঁচে থাকাকালীনই সুন্দর ভাবে গুছিয়ে নিবো ওই চিরস্থায়ী জীবনের জন্য এ পর্যন্ত আলোচনা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

কবরের জীবনের স্বরূপ ও পরিচয় (বারযাখী জীবন):

বারযাখ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা-

আভিধানিক অর্থ: 'বারযাখ' (بَرزَخ) একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হলো দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী অন্তরায়, বাধা বা পর্দা। কুরআনুল কারীমে এই শব্দটি কোনো কিছুর মাঝখানের বিচ্ছেদ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ: ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায়, মানুষের মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কালকে 'আলমে বারযাখ' বা বারযাখী জীবন বলা হয়। এটি দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনের শুরু।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

"তাদের সামনে বারযাখ (এক অন্তরায়) রয়েছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।" (সূরা আল-মুমিনুন: ১০০)

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, বারযাখ হলো মৃত্যু থেকে কিয়ামতের মধ্যবর্তী একটি অবস্থান। এখানে নেককাররা শান্তিতে থাকে আর পাপিষ্ঠরা আজাবে লিপ্ত থাকে। এটি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক জগত।

বারযাখী জীবন বা কবরের জীবন কেবল ওই মাটির গর্তের নাম নয় যেখানে মৃতদেহ রাখা হয়। বরং কেউ যদি পানিতে ডুবে মারা যায়, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বা বাঘের পেটে চলে যায়, তবে তার জন্যও বারযাখী জীবন শুরু হয়ে যায়।
বারযাখী জীবনে মানুষের দেহের ক্ষয় হলেও রূহ বা আত্মা জীবিত থাকে। রূহ সুখ বা দুঃখ অনুভব করতে পারে।

এই বারযাখী জগতের নিয়মকানুন আমাদের চেনা দুনিয়ার বস্তুগত নিয়মের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। দুনিয়াতে মানুষ কোনো কষ্ট পেলে তা কেবল তার শরীরের ওপর প্রকাশ

পায়, কিন্তু বারযাখের জীবনে সমস্ত অনুভূতি সরাসরি রূহের বা আত্মার ওপর গিয়ে আঘাত করে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, কবরের এই জীবনে রূহের সাথে দেহের সম্পর্কটা এমন আধ্যাত্মিক উপায়ে যুক্ত থাকে যা মানুষের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বোঝা অসম্ভব।

তাই কোনো মানুষ দুনিয়ার বুকে যেভাবে কবরে শায়িত মৃতদেহকে একদম শান্ত ও নীরব দেখতে পায়, বারযাখের জগতে কিন্তু বিষয়টি তেমন নাও হতে পারে; সেখানে হয়তো ওই বান্দা তার নেক আমলের কারণে জান্নাতী সুখে ভাসছে, অথবা অবাধ্যতার কারণে কঠিন আজাবের আগুনে জ্বলছে।

বারযাখী জীবন হলো মানুষের পরকালীন আদালতের এমন এক প্রাথমিক হাজতখানা, যেখানে চূড়ান্ত ফয়সালা হওয়ার আগেই বান্দা তার দুনিয়ার কর্মের ভালো বা মন্দ ফলাফলের আংশিক স্বাদ পেতে শুরু করে।
এই অদৃশ্য বা গায়েবানা জগতের স্বরূপ বুঝতে হলে আমাদের ঈমানের গভীরতা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ মনে করে যে মানুষটি মারা গেল, তার তো সবকিছুই শেষ হয়ে গেল; কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু হলো কেবলই এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরের নাম। বারযাখের এই জগতটি আমাদের চোখের সামনে পর্দা দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে, যাতে দুনিয়াতে মানুষের ঈমানের পরীক্ষাটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যদি দুনিয়ার মানুষ কবরের ভেতরের সেই আজাবের আওয়াজ বা জান্নাতের সুবাস সরাসরি নিজেদের কানে শুনতে পেত, তবে এই পৃথিবীতে কেউ আর কোনো পাপ করার সাহস পেত না এবং মানুষের পরীক্ষার কোনো যোগ্যতাই থাকত না।

আল্লাহর রাসূল (সা.) হাদীস শরীফে বলেছেন, মানুষ আর জীন জাতি ছাড়া সৃষ্টির বাকি সমস্ত জীব-জন্তু কিন্তু কবরবাসীর এই বারযাখী অবস্থার চিৎকার বা শান্তি পরিষ্কার বুঝতে পারে। অনেক সময় আমরা দেখি কোনো কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গৃহপালিত পশুরা হঠাৎ চমকে ওঠে বা ভয় পায়, সালাফদের মতে এটি বারযাখী জগতের সেই অদৃশ্য প্রভাবেরই একটি বাহ্যিক লক্ষণ।

তাছাড়া, বারযাখের আরেকটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো—এখানে সময়ের হিসাব দুনিয়ার মতো নয়। দুনিয়ার হাজার বছর বারযাখের নেককার বান্দার কাছে মাত্র কয়েক মিনিটের মতো মনে হবে, আর পাপিষ্ঠদের কাছে এক একটি রাত মনে হবে হাজার বছরের চেয়েও দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক। বারযাখী জীবন হলো এমন এক অলৌকিক সেতু, যা মানুষের ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াকে তার চিরস্থায়ী আখেরাতের সাথে নিখুঁতভাবে জুড়ে দেয়।

বারযাখী জীবন সবার জন্য একরকম হবে না। আমল ও ঈমানের পার্থক্যের কারণে এখানে মানুষের কয়েকটি স্তর থাকবে।

নবীদের জীবন: আম্বিয়া আলাইহিস সালামগণ কবরে জীবিত এবং তারা সেখানে সালাত আদায় করেন (সহীহ মুসলিমের হাদিস অনুযায়ী)। তাদের বারযাখী জীবন সাধারণ মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা এবং উচ্চমর্যাদার।

নবীদের বারযাখী জীবন সাধারণ মানুষের কল্পনা ও অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে। তাঁরা কবরে জীবিত এবং আল্লাহর বিশেষ নেয়ামতে ধন্য।
হাদিসের দলিল: রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

"الأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ"

"নবীগণ তাঁদের কবরে জীবিত এবং তাঁরা সেখানে সালাত আদায় করেন।" (মুসনাদে আবু ইয়ালা: ৩৪২৫; সহীহ আল-জামে: ২৭৯০)

মিরাজের ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি,মেরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মূসা (আ.)-কে তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। (সহীহ মুসলিম: ২৩৭৫)

অর্থ্যাৎ নবীদের দেহ মাটি স্পর্শ করে না, কারণ আল্লাহ তায়ালা জমিনের জন্য নবীদের দেহ ভক্ষণ করা হারাম করে দিয়েছেন। তাঁদের এই জীবন হলো 'হায়াতে দাউইমি' বা নিরবচ্ছিন্ন জীবন, যা অত্যন্ত উচ্চমর্যাদার।

শহীদদের জীবন: শহীদদের রূহ জান্নাতের সবুজ পাখির পেটে করে ঘুরে বেড়ায়।

শহীদগণ কবরের সাধারণ পরীক্ষা বা সওয়াল-জওয়াব থেকেও মুক্ত থাকতে পারেন এবং তাঁদের রূহ সরাসরি জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করে।

কুরআনের আয়াত: আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে করো না; বরং তারা তাদের রবের কাছে জীবিত এবং তারা রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছে।" (সূরা আল-ইমরান: ১৬৯)

রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদদের রূহ সম্পর্কে বলেছেন:

"শহীদদের রূহসমূহ সবুজ পাখির পেটের ভেতরে থাকে, তাদের জন্য আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপ রয়েছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়ায়..." (সহীহ মুসলিম: ১৮৮৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদিসটি অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য বহন করে। এটি কেবল একটি উপমা নয়, বরং শহীদদের বারযাখী জীবনের উচ্চমর্যাদার বাস্তব প্রতিফলন।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর মতামত:

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাঁর 'আত-তাযকিরা' কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে:ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেছেন:

"قَالَ عُلَمَاؤُنَا: أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ. وَهَذَا تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مَحْبُوسَةً فِي الْقُبُورِ، بَلْ هِيَ مُنَعَّمَةٌ بِالطَّيَرَانِ وَالرِّزْقِ، لِأَنَّ الشَّهِيدَ بَذَلَ نَفْسَهُ لِلَّهِ، فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ هَيْكَلًا خَيْرًا مِنْ هَيْكَلِهِ، وَفَسِحَ لَهُ فِي كَوْنِه".

ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর এই বক্তব্যের সারমর্ম হলো, শহীদদের রূহ যখন দেহ ত্যাগ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের এক অসাধারণ জগত উপহার দেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন:

১. সাধারণ মানুষের রূহ কবরের সীমানায় বা তার বিশেষ স্তরে অবস্থান করলেও শহীদদের জন্য কোনো সীমানা নেই। তারা জান্নাতের বিশালতায় উড়ে বেড়ায়।
২. ইমাম কুরতুবী স্পষ্ট করেছেন যে, শহীদদের এই 'সবুজ পাখির দেহ' লাভ করাটা কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়। বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পুরস্কার। যেহেতু শহীদ দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজের প্রিয় দেহকে বিলিয়ে দিয়েছেন, তাই প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাকে জান্নাতে বিচরণের জন্য একটি সুন্দর ও দ্রুতগতির 'বাহন' (পাখির দেহ) দান করেন।
৩. আরশের সাথে সম্পর্ক অর্থাৎ রূহগুলো যখন জান্নাতে বিচরণ শেষে আরশের নিচে ঝোলানো প্রদীপগুলোতে ফিরে আসে, তখন তারা মূলত মহান আরশের মালিকের সরাসরি নূর বা আলোর সান্নিধ্যে থাকে। এটি বারযাখী জীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি।

ইমাম কুরতুবীর মতে এই বিশেষ নেয়ামত কেবল শহীদদের জন্যই খাস, যা প্রমাণ করে বারযাখ সবার জন্য সমান নয়।
ইমাম কুরতুবীসহ অনেক জুরহুর আলেম মনে করেন, এটি একটি বাস্তব অবস্থা। আল্লাহ তায়ালা শহীদদের রূহকে একটি 'বাহন' বা পাখির আকৃতি দান করেন যাতে তারা জান্নাতের নেয়ামতগুলো সরাসরি উপভোগ করতে পারে। রূহ যেহেতু অদৃশ্য, তাই তাকে জান্নাতের ফলমূল ভক্ষণ বা ঝরনার পানি পানের অনুভূতি দিতে এই পাখির দেহটি একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

এই পাখির রূপকটি শহীদদের রূহের অবাধ স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। সাধারণ মুমিনের রূহ কবরে আবদ্ধ বা নির্দিষ্ট স্থানে থাকলেও শহীদদের রূহকে আল্লাহ তায়ালা সারা জান্নাত বিচরণ করার অনুমতি দেন। 'সবুজ' রংটি জান্নাতের শান্তি এবং সজীবতার প্রতীক।

পাখির পেটে থেকে রূহগুলো যখন আল্লাহর আরশের নিচে প্রদীপের মধ্যে আশ্রয় নেয়, তখন তারা মহান রবের সাথে সরাসরি কথোপকথনের স্বাদ পায়। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটি প্রমাণ করে যে শহীদদের মৃত্যু কেবল দেহের পরিবর্তন, কিন্তু তাদের চেতনা ও রিযিক গ্রহণের ক্ষমতা মুমিনদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।

বারযাখী জীবনের স্তরের মধ্যে 'শাহাদাত' যে কত বড় মাকাম, তা বোঝার জন্য সাহাবায়ে কেরামের জীবনের ঘটনাগুলো শ্রেষ্ঠ দলিল।

হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারায় মনে মনে প্রচণ্ড আক্ষেপ করতেন। তিনি বলতেন, "আল্লাহ যদি আমাকে পরবর্তীতে কোনো যুদ্ধের সুযোগ দেন, তবে আল্লাহ দেখবেন আমি কী বীরত্ব দেখাই!" অবশেষে ওহুদ যুদ্ধের দিন এলো। যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন মুসলিম বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ল এবং গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদ হয়েছেন, তখন অনেক সাহাবী হতাশ হয়ে অস্ত্র ছেড়ে বসে রইলেন।
তখন আনাস ইবনে নযর (রা.) তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা বসে আছ কেন?" তাঁরা বললেন, "রাসূল (সা.) তো শহীদ হয়েছেন!" আনাস (রা.) এক অবিস্মরণীয় উত্তর দিলেন:
"রাসূল (সা.) যদি শহীদ হয়ে থাকেন, তবে তাঁর পর বেঁচে থেকে কী লাভ? তোমরাও সেই লক্ষ্যেই যুদ্ধ করে প্রাণ দাও যে লক্ষ্যে তিনি প্রাণ দিয়েছেন!"

অতঃপর তিনি কাফির বাহিনীর দিকে অগ্রসর হলেন। পথে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.)-এর সাথে তাঁর দেখা হলো। আনাস (রা.) চিৎকার করে বললেন:
"হে সা'দ! ওহুদ পাহাড়ের ওপাশ থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি! আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের ঘ্রাণ অনুভব করছি!

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের মৃত্যুর আগেই বারযাখী জীবনের নেয়ামতের কিছু অংশ আস্বাদন করান। আনাস ইবনে নযর (রা.)-এর নাসিকারন্ধ্রে যে জান্নাতের সুঘ্রাণ এসেছিল, তা কেবল কল্পনা ছিল না; বরং তা ছিল বারযাখের জগত ও দুনিয়ার মাঝখানের পর্দা সরে যাওয়ার অলৌকিক মুহূর্ত।
এরপর তিনি বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হলেন। যুদ্ধের পর তাঁর শরীরে তলোয়ার, তীর ও বর্শার আশিটিরও বেশি আঘাত পাওয়া গিয়েছিল। তাঁর দেহ এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, কেউ তাঁকে চিনতে পারছিল না। অবশেষে তাঁর বোন তাঁর আঙুলের একটি তিল বা বিশেষ চিহ্ন দেখে তাঁকে শনাক্ত করেন।

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, শহীদরা যখন শাহাদাতের স্তরে পৌঁছান, তখন তাঁদের কাছে দুনিয়ার মায়া বা দেহের যন্ত্রণার চেয়ে বারযাখের জান্নাতের নেয়ামত বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। এই স্তরে পৌঁছালে কবরের একাকীত্ব বা অন্ধকার আর ভয়ের বিষয় থাকে না।

সাধারণ মুমিন: মুমিন ব্যক্তির কবর আমল অনুযায়ী প্রশস্ত করা হয়।একজন সাধারণ নেককার মুমিনের জন্য কবর হবে এক প্রশান্তির নীড়। এখানে কোনো শারীরিক কষ্ট থাকবে না, বরং জান্নাতের নিয়ামত বরাদ্দ থাকবে।
মুমিন বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন তাঁর ঈমানের দৃঢ়তার কারণে তিনি মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত শান্তভাবে প্রদান করেন। এরপর তাঁর জন্য জান্নাতের বাতায়ন বা জানালা খুলে দেওয়া হয়।

যখন মুমিন ব্যক্তি সওয়াল-জওয়াবে উত্তীর্ণ হয়, তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করেন:
"আমার বান্দা সত্য বলেছে, তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরের সাথে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ)

কবরের প্রশস্ততা: মুমিনের আমল অনুযায়ী তার কবরকে সত্তর হাত পর্যন্ত প্রশস্ত করা হয় এবং তা নূর বা আলোতে ভরে দেওয়া হয়। এটি কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য এক আরামদায়ক বিশ্রামের স্থান হবে।

সাধারণত আমরা কবরের যে সংকীর্ণ গর্ত দেখি, মুমিনের জন্য তা মোটেও তেমন থাকে না। বরং তাঁর নেক আমলের বরকতে এক বিশাল প্রাসাদে পরিণত হয়।
হাদিসে এসেছে, মুমিনের জন্য তাঁর কবরকে 'সত্তর হাত দীর্ঘ এবং সত্তর হাত প্রশস্ত' করা হয়। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তাঁর কবরকে তাঁর 'দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত' প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।

কবরের অন্ধকার দূর করে সেখানে এমন এক নূর বা আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, যা পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মুমিনের কবরকে নূরে ভরপুর করে দেওয়া হয়।" (সহীহ মুসলিম)

বারযাখী জীবনে মুমিনের সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো প্রতিদিন নিজের চূড়ান্ত গন্তব্য (জান্নাত) দেখতে পাওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:
"তোমাদের কেউ যখন মারা যায়, তখন সকাল ও সন্ধ্যায় তার সামনে তার গন্তব্যস্থল পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয় তবে জান্নাতীদের স্থান দেখানো হয়... এবং বলা হয়, 'এটিই তোমার আসল ঠিকানা, যেখানে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে পৌঁছাবেন'।" (সহীহ বুখারী: ১৩৭৯)

মুমিন যখন সফলভাবে কবরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে এক বিশেষ সম্মান দিয়ে বলেন:

"نَمْ نَوْمَةَ العَرُوسِ الَّذِي لاَ يُوقِظُهُ إِلاَّ أَحَبُّ أَهْلِهِ إِلَيْه"

"তুমি সেই নববধূর মতো নিশ্চিন্তে ঘুমাও, যাকে তার পরিবারের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না।" (সুনানে তিরমিজি: ১০৭১)
এই হাদিসটি অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে 'নববধূ'র উপমা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তি দুনিয়ার সব ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা ভুলে পরম শান্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্রাম নেবেন।

বারযাখী জীবনে মুমিনের আমলগুলো (নামাজ, রোজা, সদকা) তাঁকে পাহারা দেয়।

কেন একজন মুমিনের জন্য কবরে আজাব হবে না বরং প্রশান্তি হবে—এটি কেবল একটি পরকালীন বিষয় নয়, এর একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে।

দুনিয়ার জীবন হলো 'নফস' (প্রবৃত্তি) এবং 'রূহ' (আত্মা)-এর নিরন্তর যুদ্ধের ক্ষেত্র। মানুষের প্রবৃত্তি সর্বদা তাকে আরাম-আয়েশ, গোনাহ এবং দুনিয়াদারির দিকে টানে। অন্যদিকে রূহ তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য এবং উচ্চতর নৈতিকতার দিকে টানে।

একজন মুমিন দুনিয়াতে স্বেচ্ছায় নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করেন। তিনি মাঝরাতে আরামের ঘুম হারাম করে সালাত আদায় করেন, ক্ষুধার্ত থেকেও রোজা রাখেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যের হক নষ্ট করেন না। তিনি মূলত দুনিয়াতে থাকতেই নিজের প্রবৃত্তিকে 'শাস্তি' বা অনুশাসনে রাখেন।

মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদাকে জবাই করার কারণে বারযাখে তার রূহ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ইমাম গাজালী (রহ.)-এর মতে, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজের নফসকে কবরে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে, কবরে তার নফস আর তাকে কষ্ট দিতে পারে না।

যে আত্মা দুনিয়াতে আল্লাহর জিকির ও স্মরণে অভ্যস্ত হয়ে প্রশান্ত (নফসে মুতমাইন্নাহ) হয়ে গেছে, কবরের নির্জনতা তার কাছে নতুন কোনো বিষয় নয়। কারণ সে দুনিয়াতেও নির্জনে আল্লাহর সাথে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল। তাই কবরের অন্ধকার তার আধ্যাত্মিক আলোর কাছে হার মানে।

কল্পনা করুন সেই মুহূর্তটি, যখন চারদিকের কোলাহল থেমে গেছে। আপনার প্রিয়জনেরা আপনার দেহের ওপর শেষ মাটিটুকু দিয়ে অশ্রুসজল চোখে বাড়ির দিকে ফিরছে। আপনি এখন এক অন্ধকার, সংকীর্ণ গর্তে একা। মাটির গন্ধ আর এক অদ্ভুত নিরবতা আপনাকে ঘিরে ধরেছে। কোনো আলো নেই, কোনো আপনজন নেই।

কিন্তু আপনি যেহেতু দুনিয়াতে আপনার রবের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন, তাই হঠাৎ আপনি অনুভব করবেন—এক স্নিগ্ধ, সুশীতল বাতাস আপনার কবরের ভেতরে প্রবেশ করছে। সেই বাতাসে দুনিয়ার কোনো ফুলের ঘ্রাণ নয়, বরং জান্নাতের মিশক ও আম্বরের সুবাস মিশে আছে। যে কবরটিকে আপনি অন্ধকার গর্ত মনে করেছিলেন, হঠাৎ তা আপনার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যাবে। জান্নাতের জানালা দিয়ে আপনি দেখতে পাবেন আপনার জন্য বরাদ্দকৃত সেই সুউচ্চ প্রাসাদ।

ফেরেশতারা আপনাকে বলবে, "এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাও। কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো রোগ নেই, নেই কোনো হিসাবের ভয়।" আপনার আমলগুলো তখন জীবন্ত হয়ে

আপনার চারপাশে নূরের মতো জ্বলতে থাকবে। অন্ধকার কবরে কুরআন তেলাওয়াতের সেই নূর আপনার সঙ্গী হবে। সেই সময় আপনার মনে হবে— "হায়! কিয়ামত যদি এখনই কায়েম হতো! আমি যদি এখনই আমার রবের সেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারতাম!"
কবরের জীবন মুমিনের জন্য তখন আর ভয়ের বিষয় থাকে না, বরং তা হয় এক দীর্ঘ মধুর অপেক্ষার প্রহর। দুনিয়ার সব লড়াইয়ের পর একজন পরিশ্রান্ত যোদ্ধা যেমন শান্তিতে ঘুমান, মুমিন ব্যক্তিও কবরে ঠিক তেমনই শান্তির স্বাদ পেতে থাকেন।

বর্তমান যুগকে বলা হয় 'ফিতনার যুগ'। আজ আমাদের নফস বা প্রবৃত্তিকে প্রলুব্ধ করার জন্য হাজারো আয়োজন আমাদের হাতের মুঠোয়। এই যান্ত্রিক যুগে নফস ও রূহের লড়াই আরও কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজকের দিনে স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়া হলো নফসের সবচেয়ে বড় চারণভূমি। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ইউটিউবের স্ক্রল লিস্টে তাকালে দেখা যায় অশ্লীলতা, বেহায়াপনার,গায়রতহীনতা,পরনিন্দা (গীবত), এবং অহেতুক সময়ের অপচয়। নফস সর্বদা চায় নতুন নতুন সস্তা বিনোদন এবং অন্যের জীবনের সাথে নিজের তুলনা করে অহংকার বা হীনম্মন্যতায় ভুগতে। অন্যদিকে, রূহ মুমিনকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে— "তোমার এই প্রতিটি সেকেন্ডের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে।”

একজন মুমিন যখন গভীর রাতে একাকী ঘরে বসে থাকেন, তখন তার সামনে স্মার্টফোনে কোনো গুনাহের হাতছানি আসে। নফস বলে, "কেউ তো দেখছে না, একবার দেখলেই বা কী!" কিন্তু রূহ চিৎকার করে বলে, "আল্লাহ দেখছেন এবং কবরের সেই সংকীর্ণ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে এই কাজের সাক্ষী তোমার সাথেই থাকবে।" মুমিন যখন আল্লাহর ভয়ে সেই অশ্লীল ছবি বা ভিডিও থেকে চোখ সরিয়ে নেয়, তখনই মূলত তার রূহ জয়ী হয়।

দুনিয়াতে যারা এই 'ডিজিটাল ফিতনা' থেকে নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কবরে তারা এর এক বিশেষ প্রতিদান পাবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কবরে মুমিনের সৎ আমলগুলো একটি সুন্দর আকৃতি ধারণ করে তার সামনে আসবে। যারা দুনিয়াতে

পরনিন্দা বা গীবত থেকে নিজেদের ফেসবুক ওয়াল বা মুখকে পবিত্র রেখেছে, কবরে তাদের আমলগুলো সুঘ্রাণ ছড়াবে। কবরের সেই একাকীত্বের মুহূর্তে, যেখানে কেউ কথা বলার থাকবে না, সেখানে এই ত্যাগ করা 'গুনাহগুলোই' নূর হয়ে মুমিনকে সঙ্গ দেবে। আধুনিক যুগের এই নফস নিগ্রহের কঠিন সাধনাই তাকে কবরের কঠিন সওয়াল-জওয়াব থেকে মুক্তি এনে দেবে।

সাহাবায়ে কেরাম জান্নাতের সুসংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও কবরের ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত থাকতেন। তাঁদের এই ভয় এবং একইসাথে আল্লাহর রহমতের ওপর অটল আশা আমাদের জন্য এক বড় উদাহরণ।

হযরত উসমান (রা.)-এর জীবন ছিল অত্যন্ত পুণ্যময়। কিন্তু যখনই তিনি কোনো কবরের পাশে দাঁড়াতেন, তাঁর চোখ দিয়ে এত পানি পড়ত যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে বলা হলো, "আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা শুনে এত কাঁদেন না, যতটা কবরের কথা শুনে কাঁদেন, এর কারণ কী?" তিনি কাঁপতে কাঁপতে উত্তর দিলেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন, কবর হলো পরকালের প্রথম স্টেশন। যে এখানে উত্তীর্ণ হবে, তার পরবর্তী সফরগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর আমি জানি না আমার প্রথম স্টেশনের অবস্থা কী হবে।" এটি আমাদের শেখায় যে, আমল যত বেশিই হোক, আল্লাহর ভয় অন্তরে রাখা প্রস্তুতির অংশ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) মৃত্যুর সময় কাঁদছিলেন। মানুষ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কেন কাঁদছেন?" তিনি বললেন, "আমি তোমাদের এই দুনিয়ার মায়ায় কাঁদছি না। আমি কাঁদছি আমার সফরের দৈর্ঘ্য এবং আমার পাথেয় বা সম্বল অল্প হওয়ার কারণে। আমি এখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের এক উঁচুপথে দাঁড়িয়ে আছি এবং আমি জানি না আমাকে কোন দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" এই ঘটনাটি কবরের দীর্ঘ বারযাখী সফরের গুরুত্ব তুলে ধরে।

আর বর্তমানে আমরা শেষ জামানায় অবস্থান করছি।শেষ জামানা বা ফিতনার এই চরম মুহূর্তে একজন মুমিনের জন্য ঈমান রক্ষা করা তপ্ত কয়লা হাতের রাখার মতো

কঠিন। চারদিকে যখন গুনাহের আয়োজন উন্মুক্ত, তখন নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহভীতি বজায় রাখার প্রতিদানও হবে আকাশচুম্বী।

শেষ জামানায় যখন সুন্নাহর অনুসরণ উঠে যাবে এবং মানুষ দ্বীন থেকে বিমুখ হতে থাকবে, তখন যারা দৃঢ়ভাবে আমল করবে, তাদের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করা হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:
"তোমাদের সামনে আসছে ধৈর্যের দিন। তখন ধৈর্য ধারণকারী ব্যক্তির সওয়াব হবে তোমাদের (সাহাবীদের) মতো আমলকারী ৫০ জন ব্যক্তির সমান।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্য থেকে ৫০ জন নাকি তাদের মধ্য থেকে?" তিনি বললেন, "বরং তোমাদের মধ্য থেকে ৫০ জনের সমান।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪৩৪১, তিরমিজি: ৩০৫৮)

সাহাবীগণ সরাসরি রাসূল (সা.)-কে দেখে ঈমান এনেছিলেন, কিন্তু শেষ জামানায় মানুষ তাঁকে না দেখে এবং চরম বৈরী পরিবেশে ঈমান রক্ষা করবে বলেই তাদের এই অকল্পনীয় সম্মান দেওয়া হবে।

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনা হলো অশ্লীলতা ও জৈবিক প্রবৃত্তির হাতছানি। বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের জন্য নফস কন্ট্রোল করা সবচেয়ে কঠিন কাজ।

সাত শ্রেণির ব্যক্তি কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে, যার মধ্যে অন্যতম হলো:
"এমন যুবক যার যৌবনকাল আল্লাহর ইবাদতে অতিবাহিত হয়েছে।" এবং "এমন ব্যক্তি যাকে কোনো সুন্দরী ও সম্ভ্রান্ত নারী (গুনাহের দিকে) আহ্বান জানায়, আর সে বলে— 'আমি আল্লাহকে ভয় করি'।" (সহীহ বুখারী: ৬৬০)
ফিতনার সময় মানুষ যখন ইবাদত ভুলে দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকে, তখন নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে ইবাদতে মনোনিবেশ করাকে রাসূল (সা.) হিজরতের সাথে তুলনা করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"

"ফিতনা-ফ্যাসাদ ও অস্থিরতার সময় ইবাদতে মশগুল থাকা আমার কাছে হিজরত করে আসার সমান সওয়াব এনে দেয়।" (সহীহ মুসলিম: ২৯৪৮)

নফসকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার পার্থিব কষ্টটা খুব সামান্য সময়ের জন্য, কিন্তু এর প্রতিদান হলো অনন্তকালের জান্নাত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন _

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

"পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করেছে এবং নফসকে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রেখেছে,জান্নাতই হবে তার আবাসস্থল।

পাপিষ্ঠ ও কাফির: তাদের জন্য বারযাখ হবে এক যন্ত্রণাদায়ক কারাগার।

যারা কুফরি করেছে বা পাপে নিমগ্ন ছিল, তাদের জন্য বারযাখ হবে এক বিভীষিকাময় কারাগার।

কুরআনের আয়াত: ফেরাউনের বংশধরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

النَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ

"সকাল-সন্ধ্যায় তাদের আগুনের সামনে পেশ করা হয়; আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন বলা হবে), ফেরাউন গোষ্ঠীকে কঠোরতম আজাবে নিক্ষেপ করো।" (সূরা গাফির: ৪৬)

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কবর এত সংকীর্ণ হয়ে যায় যে, তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকের পাঁজরের ভেতর ঢুকে যায়। (সুনানে তিরমিজি)

মুমিনদের জন্য কবর যেমন জান্নাতের বাগান, পাপিষ্ঠ ও কাফিরদের জন্য তা হবে জাহান্নামের একটি অন্ধকার গর্ত। তাদের এই জীবন আজাব, লাঞ্ছনা এবং অন্তহীন আতঙ্কে ভরপুর থাকবে।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য আজাব কেবল কবরে রাখার পর শুরু হয় না, বরং রূহ কবজের সময় থেকেই তা শুরু হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখন কোনো পাপিষ্ঠ বা কাফির ব্যক্তির মৃত্যুর সময় হয়, তখন আসমান থেকে কালো চেহারার ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়। তাদের সাথে থাকে জাহান্নামের দুর্গন্ধযুক্ত চট।

ফেরেশতারা তার রূহকে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় গালি দেয় এবং বলে— "হে পাপিষ্ঠ আত্মা! আল্লাহর ক্রোধের দিকে বেরিয়ে এসো।" রূহটি তখন দেহের ভেতর লুকাতে চায়, কিন্তু ফেরেশতারা একে এমনভাবে টেনে বের করে যেমন আগুনের শিক দিয়ে ভেজা পশম টেনে বের করা হয়। (মুসনাদে আহমাদ)

কাফিরের রূহ নিয়ে যখন ফেরেশতারা উপরে যায়, তখন আসমানের দরজাগুলো তাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

"যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তা থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবে না..." (সূরা আল-আ'রাফ: ৪০)

আল্লাহ তখন নির্দেশ দেন, "এর আমলনামা সিজ্জিন-এ লিখে রাখো।" সিজ্জিন হলো জমিনের সর্বনিম্ন স্তর, যেখানে অবাধ্যদের রূহ ও আমলনামা বন্দী থাকে।

এছাড়া মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পরপরই মাটি তাকে প্রচণ্ড জোরে চাপ দেয়।

কিন্তু পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কবর এত বেশি সংকুচিত হয়ে যায় যে, তার একদিকের পাঁজরের হাড় অন্যদিকের পাঁজরের ভেতর ঢুকে যায়। (সুনানে তিরমিজি)

যারা দুনিয়াতে আল্লাহর জমিনে অহংকার করে হেঁটেছে এবং আল্লাহর আইন অমান্য করেছে, জমিন আজ তাদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে যখন সওয়াল করা হয়, তখন সে কোনো উত্তর দিতে পারে না।

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলবে— "হা! হা! লা আদরী" (হায়! আফসোস! আমি জানি না)। সে বলবে, "মানুষ যা বলত আমি কেবল তা-ই শুনতাম।"

উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে জনৈক ফেরেশতা একটি লোহার বিশাল হাতুড়ি দিয়ে তার কপালে আঘাত করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন, সেই হাতুড়ি যদি কোনো পাহাড়ের ওপর মারা হতো, তবে পাহাড় ধূলিসাৎ হয়ে যেত। সেই আঘাতে মৃত ব্যক্তি এমন জোরে চিৎকার দেয় যে, মানুষ ও জিন ছাড়া সৃষ্টির সবকিছু তা শুনতে পায়।

সওয়াল-জওয়াবে ব্যর্থ হওয়ার পর তার জন্য জাহান্নামের একটি জানালা খুলে দেওয়া হয়।

সেই জানালা দিয়ে জাহান্নামের উত্তপ্ত লু-হাওয়া এবং দুর্গন্ধ কবরে আসতে থাকে।

কোনো কোনো হাদিসে এসেছে, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির ওপর ৯৯টি 'তিন্নীন' (বিশাল বিষধর সাপ) লেলিয়ে দেওয়া হয়। এই সাপগুলো এত বিষাক্ত যে, তাদের একটি যদি পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলত, তবে কেয়ামত পর্যন্ত জমিনে কোনো ঘাস জন্মাতো না। কিয়ামত পর্যন্ত এগুলো তাকে দংশন করতে থাকবে। (সুনানে দারেমী)

কবরে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সামনে অত্যন্ত কুৎসিত চেহারার এবং দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি আসবে।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তখন প্রশ্ন করবে: "কে তুমি? তোমার চেহারা তো অমঙ্গল নিয়ে এসেছে।"
উত্তরে সেই ব্যক্তি বলবে, "আমি তোমার দুনিয়ার সেই পাপিষ্ঠ ও ঘৃণিত আমল। তুমি আল্লাহর অবাধ্যতায় দ্রুত ছিলে এবং আনুগত্যে অলস ছিলে।" সেই কুৎসিত সঙ্গী কিয়ামত পর্যন্ত তাকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা দিতে থাকবে।

কাফিরদের জন্য বারযাখের সবচেয়ে বড় মানসিক আজাব হলো প্রতিদিন তাদের চূড়ান্ত ঠিকানা দেখানো। ফেরাউন ও তার অনুসারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:
"তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে পেশ করা হয়..." (সূরা গাফির: ৪৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজের রাতে এবং বিভিন্ন সময়ে স্বপ্নের মাধ্যমে কবরের সুনির্দিষ্ট কিছু আজাব প্রত্যক্ষ করেছেন। গুনাহের ধরন অনুযায়ী শাস্তির এই ভিন্নতা আল্লাহর ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের প্রতিফলন।

১. গীবত বা পরনিন্দার আজাব:

যারা দুনিয়াতে মানুষের সম্মান নিয়ে খেলা করত এবং আড়ালে নিন্দা করত, তাদের শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, মিরাজের রাতে তিনি এমন কিছু লোক দেখলেন যাদের নখগুলো তামার তৈরি। তারা সেই নখ দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল এবং বুকের গোশত খুবলে খুবলে ছিঁড়ছিল। জিবরাঈল (আ.) জানালেন, এরা সেই লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত (গীবত করত) এবং তাদের ইজ্জত নষ্ট করত। (সুনানে আবু দাউদ)

২. ব্যভিচার বা অশ্লীলতার আজাব:

যারা অবৈধ যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে চারিত্রিক পবিত্রতা নষ্ট করেছে, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ অগ্নিকুণ্ড। রাসূল (সা.) একটি স্বপ্নের বর্ণনায় বলেন, তিনি তন্দুর বা চুলা সদৃশ একটি গর্ত দেখলেন যার মুখ সংকীর্ণ কিন্তু নিচের দিক প্রশস্ত। সেখানে উলঙ্গ নারী-পুরুষেরা চিৎকার করছিল। নিচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা আসার সাথে সাথে তারা যন্ত্রণায় উপরে উঠে আসছিল। জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা হলো ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণী। (সহীহ বুখারী)

৩. সুদখোরদের আজাব:

সুদখোরদের শাস্তির স্বরূপ হলো এক রক্তনদী। রাসূল (সা.) দেখলেন একজন ব্যক্তি রক্তের নদীতে সাঁতার কাটছে এবং তীরের কাছে আসার চেষ্টা করছে। তীরে দাঁড়ানো এক ব্যক্তি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে আবার নদীর মাঝখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরা হলো সেই লোক যারা দুনিয়াতে সুদের কারবার করত।

৪. নামাজে অলসতা ও কুরআনবিমুখতার আজাব:

যাদের মাথা নামাজ পড়ার সময় বালিশের সাথে লেগে থাকত (অর্থাৎ অলসতা করে নামাজ পড়ত না), তাদের শাস্তি হলো— একজন ফেরেশতা বড় একটি পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে। মাথাটি আবার আগের মতো হয়ে যায় এবং পুনরায় তাকে পাথর মারা হয়। এভাবে নিরন্তর চলতে থাকে। (সহীহ বুখারী)

৫. মিথ্যাবাদীর আজাব:
যারা এমন মিথ্যা ছড়াত যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত (যেমন বর্তমানের ফেইক নিউজ বা গুজব), তাদের শাস্তি হলো— লোহার আঁকড়া দিয়ে তাদের চোয়াল চিরে মাথার পেছন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। একদিকের চোয়াল ঠিক হতে হতে অন্যদিক চেরা হয়। কিয়ামত পর্যন্ত এই বিভীষিকা চলতে থাকবে।

মুমিনের রূহ: মুমিনের রূহকে সম্মানের সাথে ইল্লিয়্যিন-এ রাখা হয়। সেখান থেকে সে জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করে।

কাফিরের রূহ: পাপিষ্ঠ বা কাফিরের রূহ সিজ্জিন-এ বন্দী থাকে এবং সেখান থেকে সে জাহান্নামের উত্তাপ ও আজাব অনুভব করে।

বারযাখী জীবনের এই স্তরবিন্যাস কেবল একটি তত্ত্ব নয়, বরং এটি একজন মুমিনের যাপিত জীবনের পাথেয়। কেন আমরা সাধারণ মুমিন থেকে 'মুহসিন' বা 'শহীদ'-এর স্তরে পৌঁছাতে চাইব—তার আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো:

১. জীবনের লক্ষ্য পুনর্নির্ধারণ:
আমরা যখন জানতে পারি যে কবরের জীবন সবার জন্য একরকম নয়, তখন আমাদের মধ্যে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষা (High Ambition) তৈরি হয়। একজন শিক্ষার্থী যেমন কেবল পাশ করার চিন্তা না করে 'গোল্ডেন এ প্লাস' পাওয়ার চেষ্টা করে, তেমনি একজন মুমিনের লক্ষ্য হওয়া উচিত কেবল কবরের আজাব থেকে বাঁচা নয়, বরং নবীদের সাথে বা শহীদদের কাতারে শামিল হওয়া।

২. কর্মের গুণগত মান (Quality of Deeds):
সাধারণ মুমিন হওয়ার জন্য কেবল ফরয ইবাদত যথেষ্ট হতে পারে, কিন্তু 'মুহসিন' হওয়ার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর ইশক বা ভালোবাসা। স্তরবিন্যাসের এই জ্ঞান আমাদের শেখায় যে, আমরা যত বেশি ইখলাসের সাথে আমল করব, আমাদের বারযাখী জগত তত বেশি আলোকিত ও প্রশস্ত হবে। এটি আমাদের 'রিয়া' বা লোকদেখানো আমল থেকে দূরে রাখে।

৩. মৃত্যুভীতির বদলে শাহাদাতের তামান্না:
শহীদদের বারযাখী জীবনের বর্ণনা শুনলে একজন মুমিনের মন থেকে মৃত্যুর ভয় দূর হয়ে যায়। সে তখন মৃত্যুকে একটি অন্ধকার গহ্বর মনে করে না বরং 'সবুজ পাখির ডানায় চড়ে জান্নাতের সফরের শুরু' হিসেবে দেখে। এই আধ্যাত্মিক শক্তিই একজন ঈমানদারকে বাতিলের সামনে আপসহীন করে তোলে।

৪. চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি:
এই স্তরবিন্যাস আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, দুনিয়াতে আমরা যেমন ভিআইপি (VIP) মর্যাদা চাই, আসল ভিআইপি মর্যাদা হলো বারযাখে ইল্লিয়্যিনের উচ্চস্তরে থাকা। এই আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কৃপণতা, হিংসা এবং অহংকার রিয়া মানুষের উপর জুলুম করা, মিথ্যা বলা আর বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় ফিতনাহ সেলিব্রটিজম থেকে মুক্ত করে। কারণ সে জানে, কবরে তার সঙ্গী হবে কেবল তার আমল, তার পদবী সেলিব্রিটিজম বা সম্পদ নয়।

পরিশেষে, বারযাখের এই বিভিন্ন স্তর আমাদের জন্য একটি সুযোগ। আমরা যদি দুনিয়াতে নিজেদের নফস বা প্রবৃত্তিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য 'কুরবান' করতে পারি, তবে আল্লাহ আমাদের রূহকে শহীদদের মতো মর্যাদা দেবেন। তাই আমাদের উচিত সাধারণ আনুগত্যের গণ্ডি পেরিয়ে ইহসান বা শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌঁছানোর নিরন্তর চেষ্টা করা।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.)-এর বিশ্লেষণ:
তিনি তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'আর-রূহ'-এ উল্লেখ করেছেন যে, বারযাখী জীবনে রূহ ও দেহের সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। যদিও দেহ মাটিতে মিশে যায়, কিন্তু রূহ একটি বিশেষ সংযোগ রক্ষা করে, যার ফলে কবরে আজাব বা সওয়াব উভয়ই অনুভূত হয়।

দুনিয়ার হিসেবে হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেলেও বারযাখী জীবনে সময়ের অনুভূতি ভিন্ন হবে। নেককার বান্দার কাছে মনে হবে তিনি কেবল ঘুমিয়েছিলেন এবং সামান্য সময় পার হয়েছে। আর পাপিষ্ঠদের কাছে এই সময় হবে দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক।

বারযাখ হলো এমন এক জগত যেখান থেকে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে পারে না এবং দুনিয়ার মানুষও সেখানকার অবস্থা সরাসরি দেখতে বা শুনতে পারে না। একেই 'পর্দা' বা অন্তরায় বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা চলে যায়, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজও শুনতে পায়।" (সহীহ বুখারী)
এ থেকে বোঝা যায়, মৃত ব্যক্তি দুনিয়ার কিছু সাড়া পেলেও সে নিজে কোনো প্রতিক্রিয়া বা যোগাযোগ করতে সক্ষম নয়।

আর ইসলামি দর্শনে বারযাখী জীবন কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং এটি খোদায়ী চিরন্তন সত্য ও ইনসাফ বা ন্যায়বিচারের এক অনিবার্য দাবি।

দুনিয়ার এই ক্ষুদ্র জীবনে আমরা প্রায়ই দেখি, একজন নিরপরাধ ব্যক্তি সারা জীবন কষ্ট ভোগ করে মারা যাচ্ছেন, আর একজন বড় মাপের জালেম বা খুনি হাজারো মানুষকে শোষণ করে আয়েশি জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করছে। দুনিয়ার আদালত অনেক সময় অপরাধীকে শনাক্ত করতে পারে না, অথবা তাকে তার অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি দিতে সক্ষম হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি যদি ১০০ জন মানুষকে হত্যা করে, তবে পার্থিব আইনে তাকে মাত্র একবারই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া সম্ভব। বাকি ৯৯ জন মানুষের রক্তের বদলা দুনিয়াতে নেওয়া অসম্ভব।
এখানেই বারযাখী জীবনের যৌক্তিকতা। মৃত্যু পরবর্তী এই জীবন যদি না থাকে, তবে সৃষ্টিকর্তার ন্যায়বিচার প্রশ্নবিদ্ধ হতো। বারযাখী জীবন হলো এমন এক প্রাক-আদালত যেখানে জালেমের শাস্তি এবং মজলুমের পুরস্কার শুরু হয়। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর কাছে কোনো কর্মই হারিয়ে যায় না।

মানুষ যখন কোনো ভালো বা মন্দ কাজ করে, তখন তার একটি প্রভাব রূহের ওপর পড়ে। মৃত্যুর মাধ্যমে দেহ ধ্বংস হলেও রূহ যেহেতু অবিনশ্বর, তাই রূহের অর্জিত সেই প্রশান্তি বা যন্ত্রণা মৃত্যু পরবর্তী জগতেই প্রকাশ পেতে থাকে। দর্শন শাস্ত্রের ভাষায় একে বলা হয় 'আইনুল ইয়াকীন' বা চাক্ষুষ সত্যের মুখোমুখি হওয়া।

বর্তমান বিজ্ঞানমনস্ক যুগে অনেকে প্রশ্ন তোলেন, যদি কবরে আজাব বা নেয়ামত চলতেই থাকে, তবে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে বা কবর খুঁড়লে কেন তা আমাদের চোখে পড়ে না? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যার উত্তর ইসলামি আকিদায় অত্যন্ত চমৎকারভাবে দেওয়া হয়েছে।

__প্রথমত, কবরের জীবন আমাদের এই বস্তুগত পৃথিবীর (Physical World) অংশ নয়। এটি একটি 'মেটাফিজিক্যাল' বা ইন্দ্রিয়াতীত জগত। মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় কেবল নির্দিষ্ট সীমার আলো ও শব্দ গ্রহণ করতে পারে। যেমন, আমরা রেডিও তরঙ্গ বা মোবাইল নেটওয়ার্কের সিগন্যাল দেখতে পাই না, কিন্তু বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে তার উপস্থিতি টের পাই। কবরের জীবন তেমনই একটি বিশেষ 'ফ্রিকোয়েন্সি' বা জগত যা চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা সম্ভব নয়।

সবচেয়ে সহজ এবং শক্তিশালী যুক্তি হলো 'স্বপ্ন'। একজন মানুষ যখন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যে তাকে বাঘ তাড়া করছে বা সে আগুনে পুড়ছে, তখন সে প্রচণ্ড ভয় পায়, ঘেমে যায় এবং শারীরিক যন্ত্রণাও অনুভব করে। কিন্তু তার পাশে জেগে থাকা মানুষটি দেখে যে সে শান্তভাবে শুয়ে আছে। পাশের মানুষটি যদি স্বপ্নদ্রষ্টার বুক চিরেও দেখে, সেখানে সে কোনো বাঘ বা আগুন খুঁজে পাবে না।

আবার যদি একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকা দুই ব্যক্তির একজন প্রচণ্ড কষ্টে থাকতে পারে এবং অন্যজন তা টের না পায়, তবে কবরের নিচে মৃত ব্যক্তি আজাবে থাকলেও বাইরের মানুষের পক্ষে তা দেখা না পাওয়াটা অত্যন্ত যৌক্তিক।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে জিবরাঈল (আ.) আসতেন এবং ওহী নিয়ে আসতেন। সাহাবীগণ পাশে বসে থাকলেও তারা জিবরাঈল (আ.)-কে দেখতেন না। অথচ রাসূল (সা.) তাঁর সাথে কথা বলতেন। সুতরাং আমাদের দেখার ক্ষমতার বাইরে কোনো কিছু অস্তিত্বহীন হওয়া প্রমাণ করে না।

قَالَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: "المَوْتُ هُوَ انْقِطَاعُ تَعَلُّقِ الرُّوحِ بِالبَدَنِ، وَتَبَدُّلُ الحَالِ، وَانْتِقَالٌ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ، وَلَيْسَ هُوَ العَدَمُ المَحْضُ"

ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন, "মৃত্যু হলো রূহের সাথে দেহের সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা এবং অবস্থার পরিবর্তন মাত্র; এটি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত হওয়া, এটি কোনো অস্তিত্বহীনতা নয়।"

এই উক্তিটি প্রমাণ করে যে, বারযাখ কোনো অন্ধকারের গহ্বর নয়, বরং এটি জীবনের একটি নতুন পর্যায় যেখানে মানুষের চেতনা আরও তীব্র হয়।

إِنَّ القَبْرَ لَيُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ: "أَنَا بَيْتُ الغُرْبَةِ، أَنَا بَيْتُ الوَحْدَةِ، أَنَا بَيْتُ التُّرَابِ، أَنَا بَيْتُ الدُّودِ." (سنن الترمذي)

কবর প্রতিদিন ডাক দিয়ে বলে, "আমি প্রবাসের ঘর, আমি একাকীত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর।"

এই আরবি ইবারতটি কবরের ভয়াবহতা এবং প্রস্তুতির আবশ্যকতা তুলে ধরে। মুমিন যখন এটি মনে রাখে, তখন তার বারযাখী জীবনের প্রস্তুতি সহজ হয়।

মৃত্যুর মুহূর্ত ও রূহ কবজের প্রক্রিয়া:

মৃত্যু কেবল একটি জৈবিক প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি এক জগত থেকে অন্য জগতে রূহের চূড়ান্ত হিজরত। এই অধ্যায়ে আমরা মৃত্যুর যন্ত্রণা এবং রূহ কবজের আধ্যাত্মিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

মৃত্যুযন্ত্রণা:

প্রত্যেক মানুষকে মৃত্যুর সময় এক প্রকার সংজ্ঞাহীনতা বা যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয়, একেই কুরআনের ভাষায় 'সাকরাতুল মাউত' (মৃত্যু যন্ত্রণা) বলা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

"মৃত্যু-যন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। (হে মানুষ!) এটিই সেই বস্তু যা থেকে তোমরা পলায়ন করতে চাইতে।" (সূরা ক্বাফ: ১৯)

স্বয়ং নবী করীম (সা.) ওফাতের সময় একটি পানির পাত্রে হাত ভেজাচ্ছিলেন এবং বারবার মুখ মুছছিলেন আর বলছিলেন— "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনেক যন্ত্রণা রয়েছে।" (সহীহ বুখারী: ৪৪৪৯)।

নবীদের এই যন্ত্রণার অর্থ হলো তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। আর সাধারণ মানুষের জন্য এটি হয় গোনাহের কাফফারা অথবা অবাধ্যতার প্রথম শাস্তি।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মৃত্যুর এক চরম বাস্তব ও অসহায় মুহূর্তের চিত্র অঙ্কন করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন:

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ * وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ * وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়, আর তোমরা তখন তাকিয়ে থাকো। এবং তোমাদের অপেক্ষা আমিই তার অধিক নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।

যদি তোমরা পরকালের হিসাব-কিতাবকে বিশ্বাস না-ই করো, তবে তোমরা কেন সেই প্রাণকে ফিরিয়ে আনো না—যদি তোমরা সত্যবাদী হও?" (সূরা আল-ওয়াকিয়াহ: ৮৩-৮৭)

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় মানুষের পার্থিব শক্তি ও দাম্ভিকতার চরম সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেছেন। তাঁর আলোচনার মূল বিষয়গুলো নিচে বিস্তারিতভাবে সাজানো হলো:

১. ইবনে কাসীর (রহ.) বর্ণনা করেন, মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তার রূহ বা আত্মা দেহের নিচের দিক থেকে গুটিয়ে আসতে আসতে কণ্ঠনালীতে (الحلقوم) এসে আটকে যায়। এটিই হলো তওবা কবুল হওয়ার শেষ সীমানা। এই পর্যায়ে মৃত ব্যক্তির চারপাশের আত্মীয়-স্বজনরা কেবল চেয়ে চেয়ে তার কষ্ট দেখে, কিন্তু কারো কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরা পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা সেই প্রাণকে এক সেকেন্ডের জন্য ধরে রাখতে পারে না। ইবনে কাসীর এখানে মানুষের চরম অসহায়ত্বের কথা বুঝিয়েছেন—যে মানুষ দুনিয়াতে নিজেকে সর্বেসর্বা মনে করত, আজ সে নিজের প্রাণটুকুও রক্ষা করতে পারছে না।

২. আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি তোমাদের চেয়ে তার অধিক নিকটবর্তী।" ইবনে কাসীর (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর প্রেরিত ফেরেশতারা ওই মুমূর্ষু ব্যক্তির সবচেয়ে কাছে থাকেন। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি তখন ফেরেশতাদের দেখতে পায়, কিন্তু পাশে বসে থাকা সুস্থ মানুষেরা তা দেখতে পায় না। এখানে 'নৈকট্য' দ্বারা শক্তির আধিপত্য বোঝানো হয়েছে। ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে রূহ কবজ করার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং মানুষের কোনো প্রযুক্তি বা প্রাচুর্য সেই ফেরেশতাদের রুখে দিতে পারে না।

৩. আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন যে— "যদি তোমরা পরকাল ও বিচার দিবসকে অস্বীকার করো, তবে সেই প্রাণকে কেন ফিরিয়ে আনো না?”

ইবনে কাসীর (রহ.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, যারা মনে করে দুনিয়াই সব এবং মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই, তারা কেন মৃত্যুর অমোঘ শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে হার মেনে যায়? যদি এই মহাবিশ্ব কোনো স্রষ্টা ছাড়াই চলত, তবে মানুষের উচিত ছিল অন্তত তার আপনজনের চলে যাওয়া রূহকে ফিরিয়ে আনা। যেহেতু তারা তা পারে না, তাই এটিই প্রমাণ করে যে জীবনের মালিক মানুষ নিজে নয়, বরং অন্য কোনো এক সুমহান সত্তা—যিনি জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালা করেন।

৪. ইবনে কাসীর (রহ.) এই আয়াতের তাফসীরে আরও কিছু হাদিস উল্লেখ করেছেন যেখানে বলা হয়েছে, এই কণ্ঠাগত প্রাণের সময় মুমিন ব্যক্তি তার গন্তব্যস্থল (জান্নাত) দেখতে পায়। তার কাছে যখন জান্নাতের সুসংবাদ পৌঁছায়, তখন সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসতে চায় না। পক্ষান্তরে, কাফির ব্যক্তি যখন জাহান্নামের ভয়াবহতা দেখে, তখন সে ফিরে আসতে চায় কিন্তু তাকে সেই সুযোগ দেওয়া হয় না।

মৃত্যুযন্ত্রণা বা 'সাকরাতুল মাউত' সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফদের (পূর্বসূরীদের) জীবনের ঘটনাগুলো আমাদের জন্য এক বড় শিক্ষা। তাঁরা জানতেন যে, মৃত্যুযন্ত্রণা কেবল শারীরিক কষ্ট নয়, বরং এটি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার এক চূড়ান্ত পরীক্ষা।

সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সোহবত পেয়েছিলেন, তাঁরাও মৃত্যুক্ষণকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতেন।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) যখন মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, তখন তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবা! আপনি তো বলতেন যে যদি কোনো বুদ্ধিমান মানুষের মৃত্যু উপস্থিত হয় তবে সে যেন তার অনুভূতি বর্ণনা করে। আপনার এখন কী অনুভূত হচ্ছে?"
বিখ্যাত এই সাহাবী উত্তর দিলেন:
"হে বৎস! আল্লাহর কসম, আমার মনে হচ্ছে যেন আমার ঘাড়ের ওপর পাহাড় চেপে বসেছে। আমার মনে হচ্ছে যেন আমার পেটের ভেতর কাঁটাভরা ডাল ঢুকিয়ে দেওয়া

হয়েছে। আমার শ্বাস নিতে এমন কষ্ট হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে আমি একটি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছি এবং আসমান-জমিন এক হয়ে আমাকে পিষে ফেলছে।"

সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১২১; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৭৮৩০; ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম, কিতাবুর রূহ, পৃষ্ঠা ২।

হযরত আবু বকর (রা.) যখন ওফাতের কাছাকাছি ছিলেন, তখন তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) শোকাতুর হয়ে একটি কবিতা পাঠ করছিলেন। তখন আবু বকর (রা.) চোখ মেলে বললেন, "হে কন্যা! এই কবিতা না পড়ে বরং আল্লাহর এই বাণীটি পাঠ করো—

'وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ'

(আর মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে; এটিই সেই বস্তু যা থেকে তোমরা পলায়ন করতে চাইতে।)"

তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা ক্বাফ-এর ১৯ নম্বর আয়াতের তাফসীর; ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল মাউত।

ইমাম হাসান বসরী (রহ.) একবার এক মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পাশে বসলেন এবং তার কষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন। ফিরে আসার পর তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। লোকজন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী হয়েছে?" তিনি বললেন:

"আমি এমন এক দৃশ্য দেখে এসেছি যার পর থেকে আমার খাবারের রুচি চলে গেছে। আল্লাহর কসম! মৃত্যু এমন এক বিভীষিকা যা দেখার পর কোনো বুদ্ধিমান মানুষ পার্থিব আনন্দ নিয়ে মত্ত থাকতে পারে না।"

তিনি প্রায়ই বলতেন, মৃত্যুযন্ত্রণা হলো একটি তলোয়ারের আশিটি কোপের চেয়েও বেশি যন্ত্রণাদায়ক, কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য এটি সহজ করে দেন।

ইমাম গাজালী, এহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬০; সিফাতুস সাফওয়াহ, ইমাম ইবনুল জাওযী।

ন্যায়পরায়ণ খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আজিজ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হলেন, তিনি তাঁর চারপাশের মানুষদের চলে যেতে বললেন। তিনি বললেন, "আমি এমন কিছু সৃষ্টিকে দেখতে পাচ্ছি যারা মানুষও নয়, জিনও নয়।" এরপর তিনি পাঠ করলেন:
'تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا'
(এটি সেই পরকাল, যা আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায় না। —সূরা কাসাস: ৮৩)"
ইমাম ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৫; তারিখুল খুলাফা, পৃষ্ঠা ২৩৪।

বিখ্যাত সংকলক ইবনে আবিদ দুনিয়া বর্ণনা করেন যে, একদা জনৈক ব্যক্তি তার পিতাকে মৃত্যুর সময় প্রশ্ন করেছিল, "মৃত্যু কেমন?" বাবা উত্তর দিলেন:
"বৎস! আমার মনে হচ্ছে যেন আসমানকে জমিনের ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছে আর আমি তার মাঝখানে পিষ্ট হচ্ছি। মনে হচ্ছে যেন আমার রূহ একটি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে বের করা হচ্ছে।"
রেফারেন্স: ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, আস-সাকরাতু ওয়াল মাউত, বর্ণনা নং ১১৮; ইমাম সুয়ূতী, শরহুস সুদূর।

সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন ইসলামের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম। তাঁদের ঈমান ছিল পাহাড়ের চেয়েও অটল এবং আমল ছিল নিখুঁত। তবুও তাঁরা মৃত্যুশয্যায় যে পরিমাণ কাতরতা ও ভয় প্রদর্শন করেছেন, তা আমাদের জন্য এক গভীর চিন্তার বিষয়।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) বা হযরত উসমান (রা.)-এর মতো মহান ব্যক্তিরা, যাঁদের জান্নাতের সুসংবাদ কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা ছিল অবারিত, তাঁরাও যদি মৃত্যুর যন্ত্রণাকে আকাশ-জমিন পিষ্ট হওয়ার সাথে তুলনা করেন, তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অবস্থা কী হতে পারে? তাঁদের এই ভয় কোনো গোনাহের কারণে ছিল না, বরং এটি ছিল আল্লাহর মহিমা এবং আখেরাতের প্রথম মনজিলের গুরুত্ব অনুধাবন করার ফল।

আমাদের বর্তমান প্রজন্মের প্রস্তুতির দিকে তাকালে দেখা যায় এক চরম বৈপরীত্য। আমরা মৃত্যুকে কেবল একটি পরিসংখ্যান বা খবরের অংশ মনে করি। সাহাবীদের এই ভয় আমাদের শেখায় যে, মৃত্যুকে কেবল শারীরিক অবসান হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি হলো অনন্তকালের সফরের শুরু। সাহাবীরা এই যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেছেন যাতে পরবর্তী উম্মত গাফেল না থাকে। তাঁরা যদি তপ্ত কয়লার মতো যন্ত্রণার কথা অনুভব করেন, তবে আমাদের এই আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং, প্রতিটি নিঃশ্বাসে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করাই হওয়া উচিত আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।

মৃত্যুযন্ত্রণা কেন এত তীব্র হয়, তার একটি চমৎকার আধ্যাত্মিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ সালাফদের বর্ণনায় পাওয়া যায়। রূহ ও শরীরের সম্পর্ক কেবল একটি খাঁচা ও পাখির মতো নয়, বরং এটি একটি গভীর জৈবিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন।

কল্পনা করুন একটি সতেজ, সবুজ ও জীবন্ত গাছ। সেই গাছের কাঁচা ছাল যদি ধারালো কোনো যন্ত্র দিয়ে টেনে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়, তবে সেই গাছের প্রতিটি তন্তু যেমন ব্যথায় কেঁপে ওঠে, রূহ বের হওয়ার সময় মানুষের প্রতিটি কোষ ও স্নায়ু ঠিক তেমনই যন্ত্রণায় নীল হয়ে যায়। রূহ দেহের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে মিশে থাকে, যেমন পানিতে চিনি মিশে থাকে। একে আলাদা করা মানে প্রতিটি অঙ্গকে জীবিত অবস্থায় ছিন্ন করা।

হাদিসে এসেছে, মৃত্যুযন্ত্রণা হলো একটি তলোয়ারের আশিটি কোপ বা করাত দিয়ে শরীর চিরে ফেলার চেয়েও কষ্টের। কারণ তলোয়ার কেবল চামড়া ও গোশত কাটে, কিন্তু মালাকুল মাউত যখন রূহ কবজ করেন, তখন তিনি প্রতিটি রগ, প্রতিটি পশমের গোড়া এবং শরীরের গভীরতম অংশ থেকে রূহকে টেনে বের করেন। এই বিচ্ছেদ বেদনা কেবল তখনই প্রশমিত হয় যখন মুমিন ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ পায়।

এই উপমাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যে শরীরের আরামের জন্য আমরা সারাজীবন ব্যয় করি, সেই শরীরই একদিন রূহ ত্যাগের সময় অসহ্য যন্ত্রণার আধার হয়ে দাঁড়াবে।

বিখ্যাত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ইমাম আবু হামিদ আল-গাজালী (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'এহয়াউ উলুমিদ্দীন' (إحياء علوم الدين)-এ মৃত্যুযন্ত্রণা নিয়ে অত্যন্ত গভীর কিছু দার্শনিক পয়েন্ট তুলে ধরেছেন।
ইমাম গাজালীর প্রধান পয়েন্টসমূহ:

১.ইমাম গাজালী বলেন, আঘাতের ব্যথা তখনই অনুভূত হয় যখন তা সরাসরি প্রাণ বা রূহের ওপর পড়ে। শরীরের অন্য অঙ্গ কাটলে রূহ ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু মৃত্যুর সময় স্বয়ং রূহের ওপরই আঘাত আসে। তাই এই ব্যথা শরীরের যেকোনো ব্যথার চেয়ে স্বতন্ত্র এবং তীব্র।

২.তিনি ব্যাখ্যা করেন, মৃত্যুর সময় মানুষের বাকশক্তি কেন হারিয়ে যায়? কারণ যন্ত্রণার তীব্রতা হৃদপিণ্ড ও মস্তিষ্ককে এমনভাবে গ্রাস করে যে, আওয়াজ করার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। যন্ত্রণার ঢেউ প্রতিটি রগ ও জয়েন্টে এমনভাবে আছড়ে পড়ে যে, মানুষ চাইলেও চিৎকার করতে পারে না।

৩.ইমাম গাজালীর মতে, মৃত্যুযন্ত্রণা মানুষকে তার পার্থিব ইন্দ্রিয়ের সীমাবদ্ধতা বুঝিয়ে দেয়। সে চোখের সামনে ফেরেশতা দেখে কিন্তু বলতে পারে না, সে জান্নাত বা জাহান্নামের সুঘ্রাণ বা দুর্গন্ধ পায় কিন্তু ইশারা করতে পারে না। এটি রূহের ওপর এক প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ইন্দ্রিয়গত চাপ সৃষ্টি করে।
রেফারেন্স: ইমাম গাজালী, এহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪র্থ খণ্ড, 'কিতাবু যিকরিল মাউত' (মৃত্যুর আলোচনা) অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৬০-৪৬২।

রূহ কবজের প্রক্রিয়া:

রূহ কবজের মুহূর্তটি জগতের সবচেয়ে রহস্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আল-কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে নিচে বর্ণিত হলো:

মালাকুল মাউত বা আজরাঈল (আ.) একা নন, বরং তিনি এক বিশাল বাহিনীর প্রধান হিসেবে উপস্থিত হন। কুরআনের ভাষায় তারা হলেন 'রাসুলুনা' (আমাদের প্রেরিত দূত)। মুমিনদের জন্য তারা আসেন উজ্জ্বল চেহারায়, যেন তাদের মুখমণ্ডল সূর্যের মতো চমকাচ্ছে। তাদের সাথে থাকে জান্নাত থেকে আনা কাফন এবং সুগন্ধি । পক্ষান্তরে, কাফিরদের জন্য তারা আসেন বীভৎস কালো চেহারায় এবং সাথে থাকে জাহান্নামের কর্কশ চট। মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ১৭৮০৩; তাফসীরে তাবারী (সূরা আন-নাযিয়াত-এর তাফসীর)।

রূহ বা আত্মা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় একটি সুনির্দিষ্ট শারীরিক ও আধ্যাত্মিক পথ অতিক্রম করে।
রূহ মানুষের পায়ের নখ ও আঙুলের দিক থেকে গুটিয়ে আসতে শুরু করে। ধীরে ধীরে শরীরের নিচের অংশ অবশ ও শীতল হয়ে পড়ে। এই সময় মৃত ব্যক্তি এক প্রকার অসাড়তা অনুভব করেন।

রূহ যখন হাঁটুর ওপর দিয়ে ঊরুতে এবং এরপর উদর অতিক্রম করে বুক ও কণ্ঠনালীর (الحلقوم) কাছে আসে, তখন মানুষের শ্বাসকষ্ট চরম আকার ধারণ করে। আল্লাহ তায়ালা একে 'গারগারা' (ঘরঘর শব্দ) বলেছেন।
যখন রূহ শরীর থেকে চূড়ান্তভাবে বের হয়ে যায়, তখন মানুষের চোখ সেই রূহকে অনুসরণ করতে থাকে। এই কারণেই মৃত্যুর পর চোখগুলো স্থির ও ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যায়।
সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ৯২০; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২৬২।

রূহটি যখন শরীর থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়, তখন মালাকুল মাউত রূহকে সম্বোধন করেন:
এ ক্ষেত্রে মুমিন ব্যক্তির রূহকে এভাবে সম্বোধন করেন: "হে পবিত্র আত্মা! যা ছিল এক পবিত্র দেহে। বের হয়ে এসো আল্লাহর প্রশান্তি ও রিযিকের দিকে এবং এমন রবের দিকে যিনি তোমার ওপর সন্তুষ্ট।" এই কথা শোনার পর রূহটি এমন সহজে বের হয়ে আসে যেমন কলস থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

আর পাপিষ্ঠ ব্যক্তির রূহকে এভাবে সম্বোধন করেন: "বের হয়ে আয় হে খবীস (অপবিত্র) আত্মা! যা ছিল এক অপবিত্র দেহে। বের হয়ে আয় লাঞ্ছনা ও আগুনের দিকে।" এই সময় রূহটি আতঙ্কে শরীরের ভেতরে ছড়িয়ে পড়তে চায়, তখন ফেরেশতারা একে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে টেনে বের করেন।
সুনানে নাসাঈ, হাদিস নং ১৮৩৩; মুসনাদে আহমাদ (বারা ইবনে আযেব বর্ণিত দীর্ঘ হাদিস)।

রূহ কবজের পরপরই মালাকুল মাউত তা সহযোগী ফেরেশতাদের হাতে সমর্পণ করেন। এরপর শুরু হয় এক অবিস্মরণীয় ঊর্ধ্বারোহণ।
মুমিনের রাজকীয় সফর শুরু হয়ে যায়। মুমিন রূহকে নিয়ে যখন ফেরেশতারা উপরের দিকে যান, তখন প্রতিটি আসমানের ফেরেশতারা সুঘ্রাণ পেয়ে জিজ্ঞেস করেন— "এই পবিত্র রূহটি কার?" তখন তাকে তার পার্থিব নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর নামে ডাকা হয়। প্রথম আসমান থেকে সপ্তম আসমান পর্যন্ত তার জন্য স্বাগত জানানো হয়। আল্লাহ তখন বলেন— "اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ" (আমার বান্দার কিতাব ইল্লিয়্যিন-এ লিপিবদ্ধ করো)। এরপর রূহকে পুনরায় কবরে ফিরিয়ে আনা হয় সওয়াল-জওয়াবের জন্য।

আর কাফিরের শুরু হয় অপমানজনক সফর। কাফিরের রূহ নিয়ে যখন প্রথম আসমানে যাওয়া হয়, তখন তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না। আল্লাহ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে নির্দেশ দেন— "اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ" (তার কিতাব সিজ্জিন-এ লিখে রাখো)। এরপর সেই রূহকে আসমান থেকে প্রচণ্ড বেগে নিক্ষেপ করা হয়।
সূরা আল-মুতাফফিফীন: ৭ ও ১৮; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইবনে কাসীর), ১ম খণ্ড।

রূহ কবজের পর মুমিন ও কাফিরের রূহকে যে দুটি ভিন্ন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, তা কেবল দুটি ভৌগোলিক অবস্থান নয়, বরং তা সম্মান ও লাঞ্ছনার সর্বোচ্চ শিখর।

১. ইল্লিয়্যিন (عِلِّيِّين): সম্মানের সর্বোচ্চ শিখর

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) এবং ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর মতে, 'ইল্লিয়্যিন' শব্দটি 'উলুউ' (উচ্চতা) থেকে এসেছে।

এটি সপ্তম আসমানের উপরে, আরশের ডান পাশে অবস্থিত। এটি জান্নাতীদের আমলনামা ও রূহ সংরক্ষণের একটি সুউচ্চ স্থান। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তুমি কি জানো ইল্লিয়্যিন কী? এটি একটি লিপিবদ্ধ খাতা, যা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা প্রত্যক্ষ করে।" (সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১৯-২১)।

মুমিনের রূহকে এত উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো তাকে সৃষ্টিজগতের সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করা। এটি প্রমাণ করে যে, যে আত্মা দুনিয়াতে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করেছে, তার স্থান নক্ষত্ররাজি ও আসমানেরও উপরে। আরশের ছায়ার নিচে এই অবস্থান মুমিনের জন্য এক পরম প্রশান্তি।

২. সিজ্জিন (سِجِّين): লাঞ্ছনার সর্বনিম্ন গহ্বর

'সিজ্জিন' শব্দটি 'সিজন' (কারাগার) থেকে এসেছে। এটি সংকীর্ণতা ও বন্দিত্বের প্রতীক।

তাফসীরে তাবারী ও ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী, এটি সপ্তম জমিনের নিচে অবস্থিত একটি অন্ধকার ও সংকীর্ণ স্থান। এটি কাফির ও পাপিষ্ঠদের আমলনামা রাখার জায়গা। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠদের আমলনামা সিজ্জিন-এ আছে।" (সূরা আল-মুতাফফিফীন: ৭)।

কাফিরের রূহকে আসমান থেকে ছুড়ে ফেলে সিজ্জিন-এ পাঠানোর অর্থ হলো তার চূড়ান্ত পতন। যে ব্যক্তি স্রষ্টাকে অস্বীকার করে নিজেকে বড় মনে করত, আজ তাকে মাটির সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষেপ করে অপমানিত করা হলো। এটি তার আধ্যাত্মিক অন্ধত্ব ও নীচতারই প্রতিফল।

"মৃত্যুর মুহূর্ত ও রূহ কবজের প্রক্রিয়া" অধ্যায়টি পর্যালোচনা করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, মৃত্যু কেবল একটি জীবনের অবসান নয়, বরং এটি একটি অবিনশ্বর সফরের শুভ সূচনা। মুমিন ব্যক্তির জন্য মৃত্যুযন্ত্রণা হলো তার শেষ কষ্ট, যার পরেই শুরু হয় জান্নাতি

সুঘ্রাণ আর ফেরেশতাদের অভ্যর্থনা। পক্ষান্তরে, পাপিষ্ঠের জন্য মৃত্যু হলো সেই বিভীষিকা, যা থেকে সে সারাজীবন পালাতে চেয়েছিল।

রূহ যখন শরীর ত্যাগ করে আসমানের দিকে যাত্রা করে, তখনই নির্ধারিত হয়ে যায় বারযাখী জীবনে সে রাজকীয় সম্মান পাবে নাকি সিজ্জিনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি হবে। এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি মানুষকে তার ক্ষুদ্রতা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার সামনে আত্মসমর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

থিসিসের এই অংশটি পড়ার সময় পাঠকের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা জরুরি:

রূহ যখন কণ্ঠনালী (الحلقوم) পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তখন তওবার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। তাই সামর্থ্য থাকতেই পরকালের পাথেয় গোছানো বুদ্ধিমানের কাজ।আর গুনাহ হওয়ার সাথে সাথেই তাওবা করে নেওয়া উচিত।

ইল্লিয়্যিন-এ স্থান পেতে হলে দুনিয়াতে রূহকে শিরক ও বিদআতের পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। বেঁচে থাকাকালীন অবস্থাতেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার চেষ্টা করতে হবে, সবসময়ই গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নফসের সাথে জিহাদ চলমান রাখতে হবে।

সাহাবীদের মৃত্যুভীতি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যেন আমরা উদাসীন না হই, আবার আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াও চলবে না।

কবরের প্রথম স্টেশন বা 'স্টেজ' সফলভাবে পার হতে হলে 'সুদৃঢ় বাক্য' বা কালিমায়ে শাহাদাতের ওপর অটল বিশ্বাস ও আমল থাকা অপরিহার্য।

আল্লাহ আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঈমানের সাথে রাখুন এবং ঈমানের উপরেই মৃত্যু দান করুন।

সালাফদের দৃষ্টিতে কবরের জীবন:

'সালাফ' বা 'সালাফে সালেহীন' বলতে ইসলামের প্রথম যুগের সেই স্বর্ণমানবদের বোঝায়—যাঁদের ঈমান, আমল ও পরকালভীতি ছিল পুরো উম্মতের জন্য আদর্শ। এই পুণ্যবান দলটির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম, তারপর তাঁদের ছাত্র তাবেয়ীগণ এবং তাঁদের পরবর্তী যুগের তাবে-তাবেয়ীগণ। বর্তমান আধুনিক সমাজের সাধারণ মানুষের কাছে কবর মানেই হলো কেবল সাড়ে তিন হাত মাটির একটি অন্ধকার গর্ত কিংবা একটি পার্থিব সমাপ্তি। কিন্তু সালাফে সালেহীনের দৃষ্টিতে কবরের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁরা কবরকে কেবল মাটির স্তূপ মনে করতেন না, বরং একে দেখতেন এক বিশাল আধ্যাত্মিক জগত, পরকালের প্রবেশদ্বার ।

দুনিয়ার চেয়ে কবরের জীবনের গুরুত্ব ও সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি

সালাফগণ গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের এই বাহ্যিক দুনিয়ার জীবন হলো কেবলই একটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্ন, আর মানুষের আসল জাগরণ ঘটে মৃত্যুর পর কবরের জীবনে প্রবেশ করার মাধ্যমে। তাঁরা মনে করতেন, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু করছে তা আসলে এক ধরণের ঘোরের মধ্যে করছে, আর মৃত্যুর প্রথম রাতেই সেই ঘোর কেটে যায়। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও সালাফদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.) কবরের একাকীত্ব ও এর গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে এক ঐতিহাসিক বাণী প্রদান করেছেন। তিনি বলতেন:

"কবর হলো এমন এক ঘর, যেখানে মানুষ হিসেবে তুমি সম্পূর্ণ একা। সেখানে তোমার কোনো ক্ষমতার দাপট থাকবে না, কোনো ধন-সম্পদ পাশে থাকবে না। সেই ঘরটি হয় তোমার জন্য জান্নাতের একটি আরামদায়ক বাগান হবে, না হয় তা পরিণত হবে জাহান্নামের একটি ভয়ানক গর্তে।

অতএব, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী রাজপ্রাসাদ সাজানোর পেছনে নিজের জীবন ক্ষয় করার চেয়ে, কবরের সেই চিরস্থায়ী অন্ধকার ঘরটিকে আমলের আলো দিয়ে সাজানো অনেক বেশি জরুরি এবং বুদ্ধিমানের কাজ।"

সালাফদের এই উক্তিটি প্রমাণ করে যে, তাঁরা কবরের জীবনকে কতটা জীবন্ত ও বাস্তব মনে করতেন। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ তাঁদেরকে কখনো গাফেল বা উদাসীন করতে পারত না, কারণ তাঁদের অন্তরে সর্বদা কবরের প্রথম রাতের সেই একাকীত্বের চিন্তা জাগ্রত থাকত।

আসুন, সালাফদের এই পবিত্র মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি আমাদের জীবন ও থিসিসের প্রেক্ষাপটে একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি। সালাফে সালেহীনের জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ও চিন্তার খোরাক ছিল কেবলই আখিরাত বা পরকাল। তাঁরা যখনই দুনিয়ার বুকে কোনো বিশাল রাজপ্রাসাদ, সুউচ্চ অট্টালিকা কিংবা বিলাসবহুল বাড়ি দেখতেন—তখন সাধারণ মানুষের মতো মুগ্ধ হয়ে যেতেন না। বরং তাঁরা সাথে সাথে নিজেদের মনকে এক মহা সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে বলতেন, "হে আমার মন! এই রাজকীয় ঘরের বা অট্টালিকার সর্বোচ্চ আয়ু তো মাত্র কয়েক বছর বা কয়েক দশক, কিন্তু মাটির নিচে যে কবরের ঘরে আমাকে একা গিয়ে ঘুমাতে হবে, তার আয়ু তো সুদীর্ঘ হাজার হাজার বছরের!"

এই গভীর ও অনন্য মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাই সালাফদেরকে দুনিয়ার সব ধরণের মোহ, লোভ-লালসা এবং অহংকার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখত। তাঁরা দুনিয়াতে একজন মুসাফির বা পথচারীর মতো জীবনযাপন করতেন এবং প্রতি মুহূর্তে মাটির নিচের সেই চিরস্থায়ী ঘরের অন্ধকার দূর করার জন্য ইবাদত, জিকির ও সৎ কাজের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ পুঁজিখন্ড বা রসদ জমাতেন। তাঁরা জানতেন, দুনিয়ার ঘর মানুষের পরিচয় প্রকাশ করে, আর কবরের ঘর মানুষের আসল চরিত্র ও আমলের পর্দা উন্মোচন করে।

সালাফদের নিকট কবরের সংজ্ঞাটি ছিল আত্মশুদ্ধির পাঠশালা। তাঁরা কবরকে শুধু ভয়ের কোনো বস্তু মনে করে দূরে ঠেলে দিতেন না, বরং প্রতিদিনের জীবনে কবরকে স্মরণে রেখে নিজেদের চরিত্র ও আত্মাকে পবিত্র করতেন। সালাফদের এই দৃষ্টিভঙ্গি আজ আমাদের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দুনিয়ার এই চাকচিক্যময় জীবনের পেছনে অন্ধের মতো না ছুটে, আমাদের আসল ঠিকানা তথা মাটির নিচের সেই সাড়ে তিন হাত ঘরের সুদীর্ঘ জীবনের জন্য আলো প্রস্তুত করাই হবে প্রকৃত সালাফ অনুসারী মুমিনের প্রধান লক্ষণ।

কবরের জীবন নিয়ে আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রিয় সাহাবী বা সহচরদের অনুভূতি কেমন ছিল, তা বুঝতে পারলে আমাদের চোখ দিয়ে অনায়াসে পানি চলে আসেবে। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সেই সৌভাগ্যবান মানুষ, যাঁরা সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে জান্নাত, জাহান্নাম আর কবরের জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ শুনেছিলেন। তাঁরা কোনো বই পড়ে বা কারোর কাছে শুনে নয়, বরং জলজ্যান্ত বাস্তবতার মতো পরকালের খবর পেয়েছিলেন। আর এই কারণেই কবরকে নিয়ে তাঁদের মনের ভয়, আবেগ আর কবরের জীবনের প্রস্তুতি ছিল আমাদের কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি। তাঁরা দুনিয়াতে বেঁচে থেকেও যেন প্রতি মুহূর্তে কবরের অন্ধকারকে চোখের সামনে দেখতে পেতেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা এবং রাসুল (সা.)-এর আজীবনের পরম বন্ধু ছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। রাসুল (সা.) যাঁর জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দুনিয়াতেই দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মহান মানুষটির কবরভীতি কেমন ছিল, তা সত্যিই অবাক করার মতো। তিনি যখনই কোনো কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখনই তাঁর পা দুটো থমকে দাঁড়াত। মাটির স্তূপের দিকে তাকিয়ে তাঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি পড়ত। একবার তিনি মাটির ওপর গজিয়ে ওঠা একটি সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলেন এবং বললেন:
"হায়! আমি যদি মানুষ না হয়ে এই মাটির বুকে সাধারণ একটা সবুজ ঘাস হতাম! যাকে কোনো চতুষ্পদ জন্তু বা পশু এসে কামড়ে খেয়ে ফেলে এবং যার কোনো অস্তিত্বই আর বাকি থাকে না। তাহলে আজ আমাকে এই কবরের অন্ধকার কুঠুরিতে একা শুতে হতো না, আর আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাব দেওয়ার বা কবরের কঠিন আজাবের কোনো ভয় থাকত না!"

শুধু তাই নয়, তিনি যখন মুসলিম জাহানের খলিফা ছিলেন, তখনো তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষকে প্রায়ই একটা কথা মনে করিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, "হে লোকসকল! তোমরা একটু হিসাব করে দেখো, তোমরা প্রতিদিন প্রতিটা সেকেন্ডে কবরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, অথচ আফসোস, তোমরা দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী খেলাধুলা আর মোহের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছ।"

রাসুল (সা.)-এর আরেকজন অত্যন্ত জাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ সাহাবী ছিলেন হযরত আবু জর গিফারী (রা.)। কবরের নিঃসঙ্গতা মানুষকে বোঝানোর জন্য তিনি একবার পবিত্র কাবার সামনে দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে এক যুগান্তকারী ও হৃদয়কাঁপানো ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি কাবার চত্বরে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "হে মক্কার মানুষ! তোমরা সবাই একটু এদিকে এসো, আমার কথা শোনো।"

মানুষ যখন তাঁর চারপাশে এসে ভিড় জমালো, তখন তিনি তাদের একটা সহজ প্রশ্ন করলেন, "তোমাদের কেউ যখন দুনিয়ার কোনো দূর-দূরান্তের সফরে বের হয়, তখন সে কি পথিমধ্যে খাওয়ার জন্য বা চলার জন্য কোনো পাথেয়, রসদ কিংবা টাকা-পয়সা সাথে নেয় না?"

উপস্থিত মানুষজন সবাই একবাক্যে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আবু জর! অবশ্যই নেয়। পাথেয় ছাড়া তো দীর্ঘ সফর করা অসম্ভব।" তখন হযরত আবু জর গিফারী (রা.) এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের পানি ছেড়ে বললেন:
"তাহলে তোমরা একটু ভেবে দেখো, পরকালের এই সফর তো দুনিয়ার যেকোনো সফরের চেয়ে কোটি গুণ বেশি দীর্ঘ এবং কঠিন! আর মনে রেখো, মাটির নিচের সেই কবরের প্রথম রাতের ভয়ংকর একাকীত্ব আর অন্ধকার কাটানোর সবচেয়ে বড় রসদ বা পাথেয় কী জানো? তা হলো—দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে রাতের ঘোর অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করা।"

আসুন, মহান সাহাবীদের এই দুটি ঘটনা আমাদের বাস্তব জীবনের সাথে মিলিয়ে একটু সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করি। সাহাবায়ে কেরামের এই কান্না বা ভাষণ কিন্তু কোনো লোকদেখানো বিষয় ছিল না। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, দুনিয়ার এই চেনা জগৎটা একদিন চোখের পলকে হারিয়ে যাবে। বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-সন্তান কেউ আমাদের সাথে কবরের ভেতরে ঢুকবে না। সেখানে আমাদের সঙ্গী হবে কেবল আমাদের আমল। হযরত আবু বকরের মতো জান্নাতী মানুষ যদি কবরের ভয়ে ঘাস হওয়ার আকুতি জানান, তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কবর নিয়ে কত বেশি ভাবা উচিত! আবার আবু জর গিফারী (রা.) আমাদের শিখিয়ে দিলেন যে, কবরের অন্ধকার দূর করার জন্য আলোর ব্যবস্থা আমাদের এই মাটির ওপর থেকেই করে যেতে হবে।

রাতের অলসতা ভেঙে যে দুই রাকাত নামাজ মানুষ আল্লাহর ভালোবাসায় পড়ে, সেই নামাজই কবরের প্রথম রাতে আলোর প্রদীপ হয়ে মুমিনের মাথার পাশে এসে দাঁড়াবে।

সাহাবীদের জীবন আমাদের জন্য এক জীবন্ত অনুকরণীয় আদর্শ। কবরকে কেন্দ্র করে তাঁদের এই কান্না আমাদের হৃদয়ের জমে থাকা পাথরের মতো কঠিন ভাবকে গলিয়ে দেয়। এই পরিচ্ছেদটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা যতই ক্ষমতা বা অর্থের মালিক হই না কেন, আমাদের শেষ ঠিকানা কিন্তু ওই সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরই। তাই সাহাবীদের মতো আজ থেকেই কবরের জীবনের আসল প্রস্তুতি নেওয়া এবং নেক আমলের পুঁজি জমিয়ে তোলাই হবে আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য।

মহান সাহাবীদের সোনালী যুগের পর আসেন তাবেয়ীগণ। তাঁরা সাহাবীদের হাত ধরে দ্বীন শিখেছিলেন এবং কবরের জীবনকে এত গভীরভাবে অনুভব করতেন যে, তা আমাদের ভাবলে অবাক হতে হয়। আমাদের কাছে কবর কেবল একটি দূরবর্তী চিন্তা, কিন্তু তাঁদের অনেকের কাছে এটি ছিল প্রতিদিনের বাস্তবতার অংশ। এমনকি তাঁদের কেউ কেউ কবরের ভয়াল রূপ চোখের সামনে তাজা রাখার জন্য নিজেদের ঘরের ভেতরেই কবরের মতো বাস্তব গর্ত খুঁড়ে রেখেছিলেন, যাতে দুনিয়ার মোহ কখনো তাঁদের ছুঁতে না পারে।

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত রাবী ইবনে খাইছাম (রহ.)-এর ঘরের কোণে একটি অদ্ভুত জিনিস ছিল। তিনি সেখানে একটা আস্ত কবরের মতো গর্ত বা কুঠুরি খনন করে রেখেছিলেন। বর্তমান যুগের মানুষ যেখানে ঘর সাজাতে ব্যস্ত, সেখানে তিনি ঘর সাজিয়েছিলেন কবরের স্মারক দিয়ে। যখনই তাঁর অন্তরে দুনিয়ার প্রতি সামান্য লোভ আসত, কিংবা ইবাদতে একটুখানি অলসতা দেখা দিত, তিনি সাথে সাথে কোনো কথা না বলে ওই গর্তের ভেতর গিয়ে শুয়ে পড়তেন।

তিনি কাফনের কাপড়ের মতো চাদর গায়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে ভাবতেন— "আমি মারা গেছি। আমার আপনজনেরা আমাকে মাটির নিচে একা ফেলে চলে গেছে। এখন ফেরেশতারা আমার হিসাব নিতে আসছে।" এই চরম বাস্তব অনুভূতি যখন তাঁর মনের ভেতর জেঁকে বসত, তখন তিনি তীব্র ভয়ে ও অনুশোচনায় গর্তের ভেতর ছটফট করে

উঠতেন এবং পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনূনের আয়াতের অনুকরণে কেঁদে কেঁদে বলতেন:

"رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا"...

অর্থাৎ: "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আর একটিবারের জন্য দুনিয়ার বুকে ফেরত পাঠান, যাতে আমি আমার ফেলে আসা জীবনে ভালো আমল বা নেক কাজ করতে পারি।"

কিছুক্ষণ কাঁদার পর তিনি নিজেই আবার গর্ত থেকে উঠে বসতেন এবং নিজের মনকে উদ্দেশ্য করে বলতেন— "হে রাবী! আল্লাহ তায়ালা তোকে আজ মেহেরবানি করে আর একটা সুযোগ দিয়েছেন। তুই তো দুনিয়ায় ফিরে আসতে চেয়েছিলি, এই দেখ তুই এখন দুনিয়াতেই আছিস! এবার অলসতা ছেড়ে নেক আমল কর। কারণ মনে রাখিস, আসল মৃত্যুর পর যখন এই গর্তে ঢুকবি, তখন কোটি বার কাঁদলেও কিন্তু ফিরে আসার আর কোনো সুযোগই পাবি না।"

তাবেয়ীদের যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সাধক ইমাম হাসান বসরী (রহ.) একবার এক পরিচিত মানুষের জানাজায় শরিক হলেন। মৃত ব্যক্তিটিকে যখন খাটিয়া থেকে নামিয়ে কবরের অন্ধকার গর্তে রাখা হচ্ছিল, তখন চারপাশের মানুষের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছিল। হাসান বসরী (রহ.) তখন কাঁদছিলেন না, বরং তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যতিব্যস্ত মানুষের দিকে তাকালেন এবং একটি সহজ কিন্তু বুক কাঁপানো প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা ভাই, এই যে মৃত ব্যক্তিটি, যাকে আজ আমরা কবরে শুইয়ে দিচ্ছি—সে যদি আজ কোনো অলৌকিক উপায়ে আল্লাহর কাছ থেকে আর একটিবারের জন্য দুনিয়ায় ফিরে আসার সুযোগ পেত, তবে সে ফিরে এসে প্রথমে কী করত বলে তোমার মনে হয়?"

লোকটি এক মুহূর্ত ভেবে উত্তর দিল, "সে তো আর এক সেকেন্ডও দুনিয়ার কাজে নষ্ট করত না! সে নিশ্চয়ই তার জীবনের আগের সব গুনাহ-খাতা ছেড়ে দিত, রাত জেগে আল্লাহর সেজদায় পড়ে থাকত, মানুষের হক থাকলে তা শোধ করত এবং বেশি বেশি ইস্তিগফার করত।"

তখন ইমাম হাসান বসরী (রহ.) এক বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের পানি ছেড়ে বললেন:
"তুমি একদম ঠিক কথা বলেছ। কিন্তু আফসোস, এই মৃত মানুষটি তো আর সেই সুযোগ কোনোদিনও পাচ্ছে না। কিন্তু তুমি আর আমি—আমরা তো এখনও জীবিত আছি! আমাদের নিঃশ্বাস তো এখনও চলছে! তাহলে আমরা কেন আজ থেকেই সেই আমলগুলো শুরু করছি না, যার জন্য এই মৃত ব্যক্তিটি আজ ছটফট করছে?

ইসলামের প্রখ্যাত পণ্ডিত ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ 'কিতাবুর রূহ'-এ সালাফ বা পূর্বসূরি আলেমদের জীবনের বহু সত্য ঘটনা, অনুভূতির বিবরণ এবং নির্ভরযোগ্য স্বপ্নের বিবরণ সংকলন করেছেন। এই গ্রন্থ থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, সালাফদের কাছে মাটির নিচের এই কবরের জীবন কোনো মৃত বা স্তব্ধ জড় বস্তু ছিল না, বরং তা ছিল এক জীবন্ত ও অনুভূতিশীল জগত।

সালাফগণ বিশ্বাস করতেন, যখন দুনিয়া থেকে কোনো সৎ, ঈমানদার বা নেককার বান্দা ইন্তেকাল করেন, তখন বারযাখী বা কবরের জগতে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। পূর্ববর্তী যুগে মারা যাওয়া পুণ্যবান সালাফদের এবং তাঁর আপন আত্মীয়-স্বজনের রূহের দল ওই নতুন রূহটিকে স্বাগত জানানোর জন্য ছুটে আসে। তারা সবাই তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে পরম মমতায় কুশল বিনিময় করে, ঠিক যেভাবে দুনিয়াতে কোনো দূরদেশ থেকে প্রিয় মানুষ ফিরে এলে আমরা তাকে আনন্দ নিয়ে বরণ করি।
তারা তখন নতুন আসা রূহের কাছে দুনিয়ার জীবন্ত মানুষদের খবর জানতে চায়। তারা জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা ভাই, দুনিয়ার অমুক মানুষের কী অবস্থা? সে কি ভালো আছে? অমুক ভাই কি এখনও বেঁচে আছে?" নতুন মৃত ব্যক্তিটি তখন যদি বলে, "আরে! তোমরা তার কথা জিজ্ঞেস করছ? সে তো আমারও অনেক দিন আগে মারা গেছে!"

তখন সালাফদের রূহের দল অত্যন্ত আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করে ইন্নালিল্লাহ পড়ে বলে:

"হায় আফসোস! সে তাহলে আমাদের এই নেককার ও পুণ্যবানদের আনন্দের জগতে আসতে পারেনি! তাকে নিশ্চয়ই তার পাপাচারের কারণে অন্য কোনো অন্ধকার ও আজাবের রাস্তা দিয়ে 'সিজ্জীনে' (জাহান্নামীদের কয়েদখানায়) বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

সালাফদের উক্তি অনুযায়ী, কবরের জীবনে মৃত মানুষেরা দুনিয়ার মানুষদের দুআর জন্য চাতক পাখির মতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকা সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন যখন মৃত বাবা-মা বা প্রিয়জনদের জন্য হাত তুলে আন্তরিকভাবে দুআ করে কিংবা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে, তখন কবরের জগতে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে।
রহমতের ফেরেশতারা উজ্জ্বল নূরের থালায় করে সেই দুআ বা নেক আমলের সওয়াবগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে মৃত ব্যক্তির কবরে নিয়ে হাজির হন। ফেরেশতারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলেন— "হে কবরবাসী! এটি দুনিয়া থেকে তোমার প্রিয় ভাই বা তোমার নেক সন্তান তোমার জন্য এক পরম ভালোবাসার উপহার পাঠিয়েছে।"

সালাফগণ বলতেন, এই উপহার বা দুআ পাওয়ার পর কবরের অন্ধকার কুঠুরিতে মৃত ব্যক্তিটি এতটাই আনন্দিত ও উৎফুল্ল হন, যা দুনিয়ার সমস্ত রাজত্ব বা ধন-সম্পদ পাওয়ার চেয়েও কোটি গুণ বেশি আনন্দের ও শান্তির।

সালাফদের দৃষ্টিতে কবরের জীবন নিয়ে এই সুদীর্ঘ, তাত্ত্বিক ও হৃদয়স্পর্শী আলোচনা থেকে আমাদের সামনে একটি মহা সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিগণ কবরকে কোনো কাল্পনিক বা অবাস্তব জগত মনে করতেন না। তাঁরা কবরকে যেমন মনে-প্রাণে ভয় পেতেন, তেমনি সেই ভয়ের চোটে হাত গুটিয়ে বা হতাশ হয়ে বসে থাকতেন না। বরং তাঁরা খুব ভালো করেই জানতেন যে, এই ঘরের অন্ধকার তাড়াতে হলে মাটির ওপর থেকেই ইবাদত, জিকির, সালাত এবং চোখের পানির মাধ্যমে আলোর মোমবাতি জ্বালিয়ে যেতে হবে।
সালাফদের এই পবিত্র ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি আজ আমাদের এক চরম শিক্ষা দেয়। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের রূপ-লাবণ্য, অর্থ-সম্পদ কিংবা ক্ষমতার চাকচিক্যে অন্ধ না হয়ে, আমাদের প্রতিদিনের ভাবনায় আমাদের আসল চিরস্থায়ী ঠিকানা—মাটির নিচের

ওই সাড়ে তিন হাত ঘরটির দিকে একটু নজর দেওয়া উচিত। আমরাও একদিন ওখানেই যাব, সালাফদের মতো আমাদেরও একদিন মাটির বিছানায় শুতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে আমাদের প্রিয় সালাফে সালেহীনের মতো কবরকে চেনার, বোঝার এবং মৃত্যুর প্রথম রাতের সেই একাকীত্ব কাটানোর জন্য আজ থেকেই খাঁটি আমল দিয়ে জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

কবরে প্রবেশের প্রথম রাত ও কবরের সংকীর্ণতা

মানুষ যখন দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে কবরের অন্ধকারে চলে যায়, তখন তার ওপর দিয়ে এমন কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত হয় যা ইতিপূর্বে সে কখনো কল্পনাও করেনি। এই প্রথম রাতটিই নির্ধারণ করে দেয় তার পরবর্তী জীবনের গতিপথ।

কবরের প্রথম রাত হবে অত্যন্ত বিভীষিকাময় ও নিঃসঙ্গতাপূর্ন ।
দুনিয়ার চাকচিক্য আর মানুষের কোলাহল ছেড়ে একজন মানুষ যখন কবরের নির্জনতায় চলে যায়,তখন তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "কবর হলো পরকালের প্রথম স্টেশন। যে এখানে মুক্তি পাবে, তার পরের ধাপগুলো সহজ হবে। আর যে এখানে মুক্তি পাবে না, তার পরের ধাপগুলো কঠিনতর হবে।" (সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ২৩০৮; ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৪২৬৭)।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত ওসমান (রা.) যখনই কবরের পাশে দাঁড়াতেন, এত কাঁদতেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তিনি বলতেন, "কবর হলো এমন এক ঘর যেখানে একা থাকতে হয়, যেখানে আমল ছাড়া কোনো বন্ধু নেই।" (তারিখুল ইসলাম, ইমাম যাহাবী)।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পরপরই মাটির প্রচণ্ড চাপের সম্মুখীন হতে হয়, কবরের এই চাপ কে 'যাগতাতুল কুবর' বা কবরের চাপ বলা হয়। এটি এমন এক বাস্তবতা যা থেকে নবী-রাসূল ও নেককার বান্দারাও পুরোপুরি মুক্ত নন।

রাসূল (সা.) বলেছেন, "কবরের একটি চাপ রয়েছে। যদি কেউ তা থেকে রক্ষা পেত, তবে সা'দ ইবনে মুআয (রা.) রক্ষা পেতেন।" (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং ২৪২৯৫; তাবারানী)।

উল্লেখ্য: সা'দ ইবনে মুআয (রা.) এমন এক মহান সাহাবী ছিলেন যাঁর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, তবুও তাঁকে কবরের সামান্য চাপ অনুভব করতে হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই চাপটি মূলত মাটির পক্ষ থেকে তার সন্তানের (মানুষের) প্রতি মমত্ববোধ অথবা অবাধ্যতার কারণে প্রতিশোধের বহিঃপ্রকাশ। মুমিনের জন্য এই চাপ হয় মা যেমন তার সন্তানকে জড়িয়ে ধরে তেমন, আর কাফিরের জন্য এটি হয় হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণকারী।

হযরত আমর ইবনুল আস (রা:) মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁর পরিবারকে বলেছিলেন, "তোমরা যখন আমাকে দাফন করবে, তখন অন্তত একটি উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করতে যতটুকু সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে অবস্থান করবে। যাতে আমি তোমাদের উপস্থিতিতে আশ্বস্ত হতে পারি এবং আমার রবের দূতদের (ফেরেশতাদের) সওয়াল-জওয়াব দিতে মানসিক শক্তি পাই।"
রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১২১।

আবু হুরায়রা (রা:) তিনি বলতেন, "আমি কিয়ামতের ভয়াবহতার চেয়েও বেশি ভয় পাই কবরের প্রথম রাতের ওই একাকীত্বকে।" তিনি প্রায়ই দোয়া করতেন আল্লাহ যেন তাকে কবরের সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করেন।

বিখ্যাত তাবিঈ রাবী ইবনে হাইসাম নিজের ঘরে একটি কবর খনন করে রেখেছিলেন। যখনই তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত আসত, তিনি সেই কবরে শুয়ে পড়তেন এবং এই আয়াতটি পাঠ করতেন— "হে আমার রব! আমাকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠান যাতে আমি নেক আমল করতে পারি।" কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই উঠে বলতেন, "হে রাবী! তোমাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এখন আমল করো।"
রেফারেন্স: হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৫।

ইমাম গাজালী (রহ.) তাঁর 'এহয়াউ উলুমিদ্দীন'-এ উল্লেখ করেছেন যে, কবরের প্রথম রাতে মানুষ যখন তার আত্মীয়-স্বজনের পায়ের আওয়াজ ফিরে যেতে শোনে, তখন তার হৃদয়ে যে হাহাকার সৃষ্টি হয়, তা পৃথিবীর কোনো যন্ত্রণার সাথে তুলনাযোগ্য নয়। এই নিঃসঙ্গতা দূর করার একমাত্র উপায় হলো দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে নিভৃতে কথা বলার অভ্যাস করা।
রেফারেন্স: এহয়াউ উলুমিদ্দীন, ৪ নম্বর খণ্ড।

আল্লাহ তায়ালাও বলেন:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপস্থিত হও।" (সূরা আত-তাকাসুর: ১-২)।

মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে 'জিয়ারতুল মাকাবির' মানে কেবল কবর যিয়ারত নয়, বরং কবরের বাসিন্দা হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। মানুষের সমস্ত দম্ভ ও প্রাচুর্য কবরের প্রথম রাতে ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

কল্পনা করুন, সারাদিন বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে থাকার পর হঠাৎ আপনাকে এমন এক জায়গায় একা রেখে আসা হলো যেখানে কোনো আলো নেই, কথা বলার কেউ নেই। কবরের প্রথম রাতটি ঠিক তেমনই। দুনিয়াতে আমরা যখন নতুন কোনো বাড়িতে যাই, আমাদের সাথে অনেক আসবাবপত্র থাকে। কিন্তু কবরের

এই নতুন বাড়িতে আমাদের সাথে কেবল একটা সাদা কাফন ছাড়া আর কিছুই থাকে না।
এই রাতে মানুষ প্রথম বুঝতে পারে যে, তার আসল আপনজন কেউ ছিল না। যাদের জন্য সে সারাজীবন খাটাখাটনি করেছে, তারাই তাকে মাটির নিচে রেখে দ্রুত ঘরে ফিরে যাচ্ছে। কবরের এই একাকীত্ব কেবল সেই দূর করতে পারে, যে দুনিয়াতে একাকী ইবাদত (যেমন তাহাজ্জুদ বা জিকির) করে অভ্যস্ত ছিল।

মানুষ দুনিয়াতে থাকার সময় তার পদমর্যাদা, ব্যাংক ব্যালেন্স এবং পরিবারের মানুষের সংখ্যা দিয়ে নিজের শক্তি পরিমাপ করে। আল্লাহ কবরকে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে দেন যে, মানুষের প্রকৃত শক্তি তার বাহ্যিক চাকচিক্যে নয়, বরং তার আত্মার পবিত্রতায়। কবরে যাওয়ার পর মানুষ যখন তার আপনজনদের পায়ের আওয়াজ শোনে যারা তাকে রেখে চলে যাচ্ছে, তখন তার মনের ভেতরের 'অহং' বা 'ইগো' পুরোপুরি চূর্ণ হয়ে যায়।

আমরা মনে করি কবর একটা জড় বস্তু, কিন্তু হাদিস অনুযায়ী কবর কথা বলতে পারে। কবরের প্রথম রাতে যখন মৃত ব্যক্তিকে ভেতরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে ডেকে কিছু কথা বলে:
পাপিষ্ঠকে বলে: "ওহে আদম সন্তান! আমার পিঠের ওপর দিয়ে যখন চলতে, তখন তো খুব হাসি-তামাশা করতে। আজ আমার পেটে এসে দেখো তোমার কী অবস্থা হয়! তুমি কি জানতে না আমি একাকীত্বের ঘর? আমি পোকামাকড়ের ঘর?"

আর মুমিনকে বলে: "স্বাগতম! তুমি যখন আমার ওপর দিয়ে হাঁটতে, তখনই আমি তোমাকে পছন্দ করতাম। আজ তুমি আমার মেহমান। দেখো, আমি তোমার জন্য কেমন আরামের বিছানা হয়ে যাই!" এরপর মুমিনের জন্য কবরটি তার চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর বড় হয়ে যায়।

রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদিস নম্বর ২৪৬৭।

আমরা আধুনিক যুগের মানুষ সামান্য অন্ধকার সহ্য করতে পারি না। ধরুন, প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রাতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেল। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। ফ্যানের বাতাস নেই, হাতে থাকা স্মার্টফোনটির চার্জও শেষ। মাত্র কয়েক মিনিটের এই অন্ধকারে আমরা ছটফট করতে থাকি, আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। আমরা অস্থির হয়ে মোমবাতি বা টর্চলাইট খুঁজি। তখন আমাদের মনে কেবল একটিই চিন্তা থাকে—কখন আলো আসবে?
অথচ একবার ভাবুন তো, কবরের সেই প্রথম রাতটির কথা। সেখানে কোনো বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই, কোনো জেনারেটর নেই, এমনকি পাশের ঘর থেকে কেউ একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়ারও নেই। দুনিয়ার অন্ধকার তো সাময়িক, কয়েক ঘণ্টা পর সূর্য উঠবেই। কিন্তু কবরের অন্ধকার হতে পারে হাজার বছরের। সেখানে আলো আসার একমাত্র মাধ্যম হলো আমাদের দুনিয়ার নেক আমল।

আমাদের এই অস্থায়ী জীবনের একটু আরামের জন্য কত আয়োজন তাই না! দামি এসি, সুন্দর বিছানা, উজ্জ্বল আলোকসজ্জা। কিন্তু যে কবরে আমাদের অনন্তকাল থাকতে হবে, সেই চিরস্থায়ী ঘরের আলোর জন্য আমাদের প্রস্তুতি কতটুকু? আমরা কি সেই রাতের জন্য কোনো 'আমলের টর্চলাইট' গুছিয়ে রেখেছি? এই ভাবনাটি থেকে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। যদি আমরা সামান্য লোডশেডিং সহ্য করতে না পারি, তবে কবরের সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার কীভাবে সহ্য করব?

হযরত উমর (রা:) যাঁর নাম শুনলে শয়তান রাস্তা পরিবর্তন করত, যাঁর সাহসিকতায় ইসলাম শক্তিশালী হয়েছিল, সেই অর্ধ-জাহানের খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) কবরকে কতটা ভয় পেতেন তা আমাদের জন্য বড় শিক্ষা। তিনি প্রায়ই নিজের দাড়ি ধরে কাঁদতেন এবং বলতেন, "হায় উমর! যদি তোমার মা তোমাকে জন্ম না দিত! যদি তুমি একটি ঘাস হতে যা পশুরা খেয়ে ফেলে!" তিনি তাঁর ছেলেকে অসিয়ত করেছিলেন, "বাবা, আমাকে যখন কবরে রাখবে, তখন আমার গাল মাটির সাথে মিশিয়ে দিও, যেন মহান আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করেন।"

হযরত উসমান (রা.) যখন জান্নাত বা জাহান্নামের আলোচনা শুনতেন, তখন তিনি যতটা না কাঁদতেন, কবরের পাশে দাঁড়ালে তার চেয়ে অনেক বেশি কাঁদতেন। মানুষ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "জান্নাত-জাহান্নামের কথায় আপনি এত কাঁদেন না, কিন্তু কবরের কথা শুনলে এত কাঁদেন কেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন, কবর হলো পরকালের প্রথম স্টেশন। যে এখানে আটকে যাবে, তার জন্য পরের সব কঠিন হবে। আর যে এখানে পার পেয়ে যাবে, তার জন্য সব সহজ। আমি ভয় পাই, আমি কি এই প্রথম স্টেশনে পাস করতে পারব?"

আচ্ছা আল্লাহ তায়ালা কেন কবরের প্রথম রাতকে এত একা করে দিলেন? এটা কি আমরা কখনো ভেবে দেখেছি? এর পেছনের বড় একটি শিক্ষা হলো—মানুষকে এটা বোঝানো যে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে মানুষের ভিড়ে থাকলেও আসলে সে একা।

আমরা দুনিয়াতে কত মানুষের মন রক্ষা করার জন্য নিজের নীতি বিসর্জন দেই, কত অবৈধ পথে সম্পদ অর্জন করি প্রিয়জনদের জন্য। কিন্তু কবরের প্রথম রাতে আল্লাহ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, যে আপনজনদের জন্য আপনি সবকিছু করলেন, তারা আপনাকে ৩ হাত মাটির নিচে রেখে বাড়িতে এসে খাওয়ার আয়োজন করছে। কবরের এই একাকীত্ব মূলত মানুষকে তার রবের দিকে ফেরার আহ্বান জানায়। দুনিয়ার মায়া যে কতটা ঠুনকো, তার বড় প্রমাণ হলো কবরের অন্ধকার ঘর।

সালাফদের যুগে জনৈক বুজুর্গ ব্যক্তি প্রতিদিন এশার নামাজের পর নিজের ঘরে তৈরি করে রাখা একটি কৃত্রিম কবরে শুয়ে পড়তেন। তিনি সেখানে অন্ধকারের মধ্যে শুয়ে নিজেকে প্রশ্ন করতেন, "হে নফস! যদি আজই তোমার শেষ রাত হতো, তবে তোমার সাথে কী থাকত?"
তিনি সেখানে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করতেন এবং এরপর উঠে এসে বলতেন, "আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে আরও একটি দিন সুযোগ দিয়েছেন।" এই যে কবরের কথা সবসময় স্মরণে রাখা, এটাই ছিল তাদের তাকওয়ার মূল চাবিকাঠি। আমরা যদি প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে অন্তত ৫ মিনিটের জন্য ভাবি যে, "আজকের বিছানাটি যদি কবরের মাটি হতো, তবে আমার অবস্থা কী হতো?"—তবে আমাদের জীবন যাপনের ধরন বদলে যেত।

পরিশেষে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে দুনিয়াতে আমরা যাই করি না কেনো কবরেরর এই নিঃসঙ্গতা, একাকীত্ব, অসহায়ত্ব,কবরের সংকীর্ণতা আর কবরের প্রথম রাতকে আলোকিত করার জন্যও আমাদের পাথেও সংরক্ষণ করে রাখতে হবে, আল্লাহর কথামতো ভালো মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে,আমলী জিন্দেগী গড়ে তুলতে হবে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পথেই চলতে হবে,দেখেন আমরা কত সাধারণ মুসলমান তাও আমাদের কোনো প্রস্তুতি নেই,অথচ সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম তারা জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েও কান্না করতে করতে দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন,কবরের ভয়াবহতা সম্পর্কে শুনে অস্থির হয়ে যেতেন,আর আমাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

কেমন যেনো সবই সাধারণ মনে হয় আমাদের কাছে তাই না?

কিসে আমাদের প্রতিনিয়ত ধোঁকা দিচ্ছে?

কোন জিনিস আমাদের কে মৃত্যু আর মৃত্যু পরবর্তী জীবন থেকে বেখেয়াল রেখেছে?

আর কতদিন নফসের তাঁবেদারি করেই যাবো, এখনও কি ঘুরে দাঁড়ানোর সময় হয়নি আমাদের?

চারদিক টা ফিতনায় ভরপুর,পরিবারে,সমাজে, রাষ্ট্রে,পুরো পৃথিবীতে পাপের সয়লাব, চলেন না আজই তাওবা ইস্তিগফার করি,বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি, মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেই!

মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব:

দাফন শেষ করে আত্মীয়-স্বজনরা যখন মাত্র ৪০ কদম দূরে যায়, তখনই কবরের পরীক্ষা শুরু হয়।
হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, কবরে দুইজন ফেরেশতা আসেন যাদের নাম 'মুনকার' ও 'নাকীর'। তাদের গায়ের রং কুচকুচে কালো এবং চোখ দুটো নীল আগুনের মতো উজ্জ্বল। তাদের কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের মতো ভয়ংকর। তাদের হাতে থাকে বিশাল লোহার হাতুড়ি, যা দিয়ে পাহাড়কে আঘাত করলে তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে মৃত ব্যক্তিকে কবরে বসিয়ে দেন। কাফির ও পাপিষ্ঠদের জন্য এই দৃশ্যটি হবে চরম আতঙ্কজনক, কিন্তু মুমিনের জন্য আল্লাহ এই ভয়কে সহজ করে দেবেন।
রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদিস নং ১০৭১; সহীহ ইবনে হিব্বান।

যখন মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয় মুমিন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেন, তখন তার অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ 'সাকিনাহ' বা প্রশান্তি নাজিল হয়। ফেরেশতাদের ভয়ংকর কণ্ঠস্বর এবং নীল আগুনের মতো চোখ দেখেও সে ঘাবড়ে যায় না। কারণ, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি প্রতিদিন পাঁচবার সালাতে তার রবের সামনে দাঁড়িয়েছে, তার জন্য এই মুখোমুখি হওয়াটা আতঙ্কের চেয়ে আনন্দের বেশি হয়। যখন সে সঠিকভাবে উত্তর দেয়, তখন জান্নাত থেকে এক শীতল বাতাস তার কবরে বইতে শুরু করে। সে তখন এতটাই আনন্দিত হয় যে, সে চায় দুনিয়ার মানুষদের ডেকে বলতে— "দেখো, আমি আমার রবের পরীক্ষায় পাস করে গেছি!" কিন্তু পর্দা পড়ে যাওয়ায় সে তা পারে না। তার কবরে তখন জান্নাতের আলোকসজ্জা এমনভাবে ফুটে ওঠে যেন সে কোনো বিয়ের বাসর ঘরে প্রশান্তিতে ঘুমাচ্ছে।

অন্যদিকে, পাপিষ্ঠ বা মুনাফিকের অবস্থা হয় বর্ণনাতীত করুণ। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে উত্তরগুলো জানে (কারণ সে দুনিয়াতে মানুষের মুখে এগুলো শুনেছিল), কিন্তু তার জবান তখন অবশ হয়ে যায়। সে প্রতিটি প্রশ্নের পর প্রচণ্ড আর্তনাদ করে বলতে থাকে— "হায়! হায়! আমি তো জানি না!" এই সময় তার হৃদয়ে এমন এক

হাহাকার সৃষ্টি হয় যা দুনিয়ার কোনো যন্ত্রণার সাথে তুলনা করা যায় না। সে তখন বুঝতে পারে, তার সারা জীবনের বিলাসিতা, ক্ষমতা আর অহংকার তাকে এই ছোট তিনটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা দিতে পারছে না। ফেরেশতাদের সেই বিকট গর্জনে তার কলিজা যেন ফেটে যেতে চায়। প্রতিটি ভুল উত্তরের পর লোহার হাতুড়ির সেই আঘাতের ভয়ে সে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যখন উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়, তখন ফেরেশতারা তার কপালে লোহার হাতুড়ি দিয়ে এমন জোরে আঘাত করেন যে, সে প্রচণ্ড চিৎকারে কেঁদে ওঠে। তার এই চিৎকার জিন ও মানুষ ছাড়া সৃষ্টির প্রতিটি জীব শুনতে পায়। এটিই হলো সওয়াল-জওয়াবের পর শাস্তির প্রথম ধাপ।

এরপর মুনকার নাকীর এসে মাইয়েতকে কবরে মূলত তিনটি প্রশ্ন করবেন।

১. মান রব্বুকা? (তোমার রব কে?): মুমিন ব্যক্তি প্রশান্ত চিত্তে উত্তর দেবে— "রাব্বিয়াল্লাহ" (আমার রব আল্লাহ)।
২. মা দ্বীনুকা? (তোমার দ্বীন বা জীবনব্যবস্থা কী?): মুমিন উত্তর দেবে— "দ্বীনিয়াল ইসলাম" (আমার দ্বীন ইসলাম)।
৩. মা কুনতা তাকুলু ফি হাযার রজুল? (এই ব্যক্তি—অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা.)—সম্পর্কে তুমি কী বলতে?): মুমিন ব্যক্তি নবীজীর নূরানি চেহারা দেখে চিনে ফেলবে এবং বলবে— "তিনি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.)।"

অন্যদিকে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে বলবে— "হা! হা! লা আদরি" (হায়! আফসোস! আমি জানি না)। সে দুনিয়াতে মানুষের মুখে শুনে অনেক কথা বলত, কিন্তু তার হৃদয়ে বিশ্বাস ছিল না বলে কবরে তার জবান আটকে যাবে।

কবরের এই পরীক্ষাকে আমরা দুনিয়ার একটি চূড়ান্ত পরীক্ষার হলের সাথে তুলনা করতে পারি।

একজন ছাত্র যদি পুরো বছর পড়াশোনা না করে এবং পরীক্ষার আগের রাতে কেবল দু-একটি প্রশ্ন মুখস্থ করে হলে যায়, তবে সে মূল পরীক্ষার কঠিন প্রশ্নের সামনে খেই হারিয়ে ফেলে। কবরের পরীক্ষাও ঠিক তেমনই। সারা জীবন আল্লাহকে ভুলে থেকে কবরে গিয়ে 'রাব্বিয়াল্লাহ' বলা সম্ভব নয়। কারণ কবরের কলমটি চলে মানুষের আমলের শক্তিতে, কেবল মেধার শক্তিতে নয়।

দুনিয়ার পরীক্ষায় আমরা মেমোরি বা মস্তিষ্ক ব্যবহার করে লিখি। কিন্তু কবরে মস্তিষ্ক পচে মাটির সাথে মিশে যায়। সেখানে জবান পরিচালিত হয় 'কলব' বা হৃদয়ের মাধ্যমে। যার হৃদয় দুনিয়াতে আল্লাহর প্রেমে সিক্ত ছিল না, তার জবান কবরের 'এক্সাম পেপারে' এক অক্ষরও লিখতে পারবে না। দুনিয়ার পরীক্ষায় দ্বিতীয় সুযোগ থাকে, কিন্তু কবরের হলে কোনো সাপ্লিমেন্টারি বা দ্বিতীয় সুযোগ নেই।

পরীক্ষার হলে যেমন পাশের বন্ধুর খাতা দেখে লেখার কোনো সুযোগ নেই, কবরেও তেমনই কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। সেখানে শিক্ষক বা গার্ড (ফেরেশতারা) অত্যন্ত কঠোর। যে ছাত্রটি সারাবছর কষ্ট করে পড়াশোনা করেছে, সে যেমন পরীক্ষার হলে হাসিমুখে কলম চালায়, একজন মুমিনও কবরে তেমনই হাসিমুখে জবান খুলে উত্তর দেয়।

দুনিয়াতে আমরা অনেক কিছু মুখস্থ করতে পারি, কিন্তু কবরে কেবল সেই উত্তরটিই মুখ থেকে বের হবে যা আমাদের অন্তরে গেঁথে ছিল। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে রব হিসেবে মান্য করেছে এবং রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী চলেছে, তার মস্তিষ্ক নয় বরং তার 'আমল' কবরে কথা বলবে।

কবরের সওয়াল-জওয়াব প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক হলো—সেখানে মানুষের মুখস্থ বিদ্যা বা পার্থিব বুদ্ধি কোনো কাজে আসে না। দুনিয়াতে একজন নাস্তিক বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও কবরের তিনটি প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলো মুখস্থ রাখতে পারে, কিন্তু কবরের সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তে তার জবান দিয়ে উত্তরগুলো বের হবে না। কেন এমন হয়, তার একটি গভীর ব্যাখ্যা রয়েছে:

১. মানুষের সমস্ত পার্থিব জ্ঞান, স্মৃতি এবং বুদ্ধি সংরক্ষিত থাকে মস্তিষ্কের নিউরনে। মৃত্যুর পর দাফন করার সাথে সাথেই এই জৈবিক মস্তিষ্ক পচতে শুরু করে এবং এক সময় মাটির সাথে মিশে যায়। কিন্তু মানুষের 'রূহ' বা 'কলব' (অন্তর) অমর। কবরে যখন রূহ ফিরিয়ে আনা হয়, তখন মানুষের চেতনা তার জৈবিক মস্তিষ্ক থেকে নয়, বরং তার কলব থেকে পরিচালিত হয়।

২. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর মতে, কবরের উত্তরগুলো আসলে মানুষের সারা জীবনের বিশ্বাসের নির্যাস। দুনিয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহকে তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে, তার কলব সেই বিশ্বাসের রঙে রঙিন হয়ে যায়। কবরে যখন ফেরেশতারা প্রশ্ন করেন, তখন মস্তিষ্ক নয়—বরং সেই হৃদয়টি উত্তর দেয়। যার হৃদয়ে আল্লাহর মহব্বত ছিল না, তার মস্তিষ্ক উত্তরগুলো জানলেও কলব তা মুখে প্রকাশ করার অনুমতি পায় না।

দুনিয়াতে আমাদের পরিচয় ছিল নাম, পদবী বা বংশ দিয়ে। কিন্তু কবরের পরীক্ষায় মানুষ তার রূহানি পরিচয়ের মুখোমুখি হয়। এটি এমন একটি চূড়ান্ত পরিক্ষা যা কিয়ামতের আগেই মানুষের গন্তব্য স্পষ্ট করে দেয়।

এই আলোচনার সারকথা হলো—কবরের পরীক্ষাটি কোনো সাধারণ মৌখিক পরীক্ষা নয়, বরং এটি মানুষের 'অস্তিত্বের পরীক্ষা'। সেখানে কেবল তা-ই প্রতিফলিত হয়, যা মানুষ গোপনে ও প্রকাশ্যে বিশ্বাস করত এবং আমল করত।

তো এই চুড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথেই কবরের পরিবেশ বদলে যায়।

যখন মুমিন সঠিক উত্তর দেয়, তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন— "আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ)।

কাফিরের ফলাফলের ক্ষেত্রে যখন সে ব্যর্থ হয়, তখন ঘোষণা আসে— "সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিছানা দাও এবং জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও।" সেই দরজা দিয়ে জাহান্নামের উত্তপ্ত হাওয়া ও বিষাক্ত ধোঁয়া কবরে প্রবেশ করতে থাকে।

মুনকার নাকীরের আগমনের সময় মৃত ব্যক্তির রূহ আবার নতুন করে কবরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়.ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লহ তার কিতাবুর রূহ বইয়ে বলেছেন, দাফনের পর মৃত ব্যক্তির রূহ আসমান থেকে পুনরায় তার শরীরের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়। তবে এই ফিরে আসা দুনিয়ার জীবনের মতো নয়। এটি একটি 'বারযাখী' সম্পর্ক। রূহটি শরীরের সাথে এমনভাবে জুড়ে দেওয়া হয় যাতে সে ফেরেশতাদের প্রশ্ন শুনতে পায় এবং কবরের চাপ বা শান্তি অনুভব করতে পারে। এই পর্যায়ে মৃত ব্যক্তির চেতনা দুনিয়ার চেয়েও হাজার গুণ বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে যায়।

সওয়াল-জওয়াব পর্বে মুমিন বান্দা যখন অত্যন্ত দৃঢ়তা ও প্রশান্তির সাথে তিনটি মৌলিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করে, তখন এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। মুনকার ও নাকীর নামক ফেরেশতাদ্বয় তখন আর পূর্বের মতো ভয়ংকর থাকেন না, বরং তাদের আচরণে এক ধরণের শ্রদ্ধাবোধ ফুটে ওঠে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বর্ণনা করেছেন যে, মুমিন ব্যক্তি যখন নবীজী (সা.)-কে চিনে ফেলে এবং তাঁর নবুওয়াতের সাক্ষ্য দেয়, তখন ফেরেশতারা অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে তাকে লক্ষ্য করে বলেন: "ক্বদ কুন্না না'লামু আন্নাকা তাকুলু হাযা"—অর্থাৎ, "আমরা জানতাম যে তুমি এভাবেই উত্তর দেবে।"

ফেরেশতাদের এই উক্তিটি মূলত মুমিন বান্দার দুনিয়াবী জীবনের একনিষ্ঠতার একটি স্বর্গীয় স্বীকৃতি। এই একটি বাক্যের মাধ্যমে ফেরেশতারা মৃত ব্যক্তিকে বুঝিয়ে দেন যে, তার ঈমান ও আমল কেবল লোকদেখানো ছিল না, বরং তা আসমানের জগতেও প্রসিদ্ধ ছিল। দুনিয়াতে যারা একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করে, আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে তাদের নিয়ে আলোচনা হয়। তাই কবরে আসার আগেই ফেরেশতারা তার দৃঢ় ঈমান সম্পর্কে অবগত থাকেন।

ফেরেশতাদের এই ইতিবাচক মন্তব্য শোনার পর মুমিন ব্যক্তির মনের সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। সে তখন বুঝতে পারে যে, সে কেবল একটি পরীক্ষা দেয়নি, বরং সে তার রবের সন্তুষ্টির চূড়ান্ত সনদ লাভ করেছে। এই পর্যায়ে ফেরেশতারা তাকে পরম মমতা ও সম্মানের সাথে বলেন, "এখন তুমি নববধূর মতো শান্তিতে ঘুমাও (নাম কানাওমাতিল আরূস), যাকে তার অতি প্রিয়জন ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না।" এই কথোপকথনটি প্রমাণ করে যে, কবরের জগতটি নেককারদের জন্য মোটেও আতঙ্কের নয়, বরং তা পরম আশ্রয়ের।
কবরের সওয়াল-জওয়াব শেষে মুমিন বান্দার যে মানসিক অবস্থা তৈরি হয়, তা দুনিয়ার কোনো বড় সাফল্যের আনন্দের চেয়েও কয়েক গুণ বেশি। এটিকে আমরা একজন পরিশ্রমী ও সফল ছাত্রের অনুভূতির সাথে তুলনা করতে পারি:

একজন ছাত্র যেমন পরীক্ষার আগের রাতে নির্ঘুম কাটায় এবং পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র পাওয়ার আগ পর্যন্ত প্রচণ্ড দুশ্চিন্তায় থাকে, মুমিন বান্দাও কবরে ফেরেশতাদের ভয়ংকর রূপ দেখে প্রথম দিকে বিচলিত হতে পারে। কিন্তু যখন সে একে একে সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে দেয়, তখন তার বুক থেকে এক বিশাল পাথর যেন নেমে যায়। দুনিয়ার সফল ছাত্র যেমন ফলাফল দেখার পর এক গভীর প্রশান্তি পায়, মুমিনও তার রবের সন্তুষ্টির বার্তা পেয়ে তার চেয়েও কোটি গুণ বেশি শান্তি অনুভব করে।

আবার কঠিন পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর একজন ছাত্র যেমন বাড়ি ফিরে গভীর ঘুমে মগ্ন হতে চায়, মুমিন বান্দাও তার জীবনের দীর্ঘ ও কঠিন পরীক্ষা (দুনিয়ার জীবন) শেষে কবরের প্রশান্তির ঘুমে বিভোর হতে চায়। ফেরেশতারা তখন তাকে বলেন, "তুমি নববধূর মতো ঘুমাও।”

আমি কিংবা আপনি যখন কোনো পরিক্ষায় প্রথম হই তখন যেমন আমরা বুঝতে পারি যে পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে আমার আপনার জন্য এখন বড় পুরস্কার অপেক্ষা করছে, মুমিনও তার উত্তর দেওয়ার পর অর্থ্যাৎ মুনকার নাকীরের পরিক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া দেখে বুঝতে পারে যে—তার অনন্তকালের রাজকীয় জীবনের সূচনা হয়ে গেছে।

কবরের সেই নিঃসঙ্গ পরিবেশে যখন মুনকার ও নাকীর মুমিন বান্দাকে বলেন, "আমরা জানতাম যে তুমি ঠিক এই উত্তরটাই দেবে," তখন মূলত এক অদ্ভুত গোপন সম্পর্কের পর্দা সরে যায়। এই কথাটা কেবল মৃত ব্যক্তি এবং মুনকার নাকীরের মধ্যে একটি সাধারণ কথা নয়; বরং এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর ফেরেশতারা আমাদের পরপারে যাওয়ার অনেক আগে থেকেই আমাদের খুব ভালো করে চেনেন।

আল্লাহ তায়ালা এই পৃথিবীতে আমাদের প্রত্যেকের সাথে কিছু ফেরেশতা নিয়োজিত করে রেখেছেন। তারা কেবল আমাদের আমলই লেখেন না, বরং ছায়ার মতো আমাদের বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখেন। আমরা যখন গভীর রাতে সবার অগোচরে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে কাঁদি, কিংবা প্রচণ্ড লোভ সামলে নিয়ে কেবল আল্লাহর ভয়ে কোনো গুনাহ ছেড়ে দেই—সেই দৃশ্যগুলো এই ফেরেশতাদের মুগ্ধ করে। আসমানের জগতে তখন সেই নেককার বান্দার নামে আনন্দের গুঞ্জন শুরু হয়। এভাবেই দুনিয়াতেই ফেরেশতাদের সাথে আমাদের এক অদৃশ্য সখ্যতা গড়ে ওঠে।

কবরে যখন প্রথমবার মুনকার ও নাকীর সামনে আসেন, তাদের ভয়ংকর রূপ দেখে যে কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। কিন্তু মুমিন বান্দা যখন বিশ্বাসের সাথে সঠিক উত্তরগুলো দিয়ে দেয়, তখন মুহূর্তেই সেই ভয়ংকর চেহারাগুলো এক পরম মমতায় ভরে ওঠে। তারা যেন তখন মুমিনকে কানে কানে বলেন— "দুনিয়াতে যখন তুমি একাকী সিজদায় লুটিয়ে পড়তে কিংবা গোপনে মানুষের উপকারে হাত বাড়িয়ে দিতে, আমরা তখন তোমার পাশেই ছিলাম। আজ আমরা তোমার সেই আমলের সাক্ষী হয়েই তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।"

কবরের সেই অন্ধকার ঘরে যখন নিজের গর্ভধারিণী মা কিংবা অতি আদরের সন্তানও পাশে থাকে না, সবাই যখন মাটি দিয়ে দ্রুত ঘরে ফিরে যায়—তখন ফেরেশতাদের এই স্বীকৃতিই হয় মুমিনের একমাত্র ভরসা। যে ফেরেশতারা দুনিয়াতে পাহারাদার ছিলেন, কবরে তারাই হয়ে যান সবচেয়ে আপন বন্ধু। তারা মুমিনকে কবরের নিঃসঙ্গতা ভুলিয়ে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এক নির্ভরতার সাথী হয়ে তার পাশে রয়ে যান।
সুনানে তিরমিজি (১০৭১) এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম-এর 'কিতাবুর রূহ'।

মুনকার ও নাকীরের সওয়াল-জওয়াব কেবল পরকালীন জীবনের একটি ধাপ নয়, বরং এটি একজন মানুষের সারাজীবনের আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত প্রতিফলন। এই পুরো আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, কবরের জগতটি মাটির নিচের কোনো অন্ধকার গর্ত নয়, বরং এটি রূহের এক নতুন ও বাস্তব জগতের প্রবেশদ্বার।এটি হলো আত্মার এক নতুন জীবনে পা রাখার প্রথম দরজা

দুনিয়াতে আমরা অনেক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হই, অনেক সার্টিফিকেট অর্জন করি; কিন্তু কবরের সেই তিনটি ছোট প্রশ্নই হবে আমাদের অনন্তকালের মুক্তি বা আজাবের মানদণ্ড। সেখানে কোনো মেধা, পদবী বা আভিজাত্য কাজে আসবে না। জবান সেদিন কেবল সেই সত্যটুকুই উচ্চারণ করবে, যা মানুষের অন্তরে গেঁথে ছিল। মুনকার-নাকীরের সেই সাওয়াল জাওয়াবের সামনে কেবল সেই ব্যক্তিই অটল থাকতে পারবে, যার প্রতিটি নিঃশ্বাস আল্লাহর সন্তুষ্টির রঙে রাঙানো ছিল। প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ছিলো,যে সবসময়ই আল্লাহর দেওয়া বিধান মতো পরিচালনা করতো।

কবরের ভয়ংকর চিত্র আমাদের যেমন সতর্ক করে, তেমনি মুমিনের জন্য ফেরেশতাদের সেই বিশেষ স্বীকৃতি— "আমরা জানতাম তুমি এভাবেই উত্তর দেবে"—আমাদের এক বিশাল আশার আলো দেখায়। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা কখনোই একা নই। আমরা যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করি, তখন আসমানের ফেরেশতারা আমাদের বন্ধু হয়ে যান এবং কবরের সেই চরম নিঃসঙ্গ মুহূর্তে তারাই আমাদের পরম সাথী হন।

কবরের এই সওয়াল-জওয়াব আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানুষ দুনিয়াতে যত বড় সামাজিক বা রাজনৈতিক শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, কবরের সেই সংকীর্ণ কুঠুরিতে সে একেবারেই একা। সেখানে তার সহায় হতে পারে কেবল তার রূহানি নূর এবং দুনিয়ার নিভৃতে করা সৎ কাজগুলো।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের শরীরের বিনাশ ঘটলেও রূহ তার পূর্ণ চেতনা নিয়ে এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়। তাই কবরের

এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এটি আত্মার জন্য এক নতুন উচ্চতর জগতের প্রবেশদ্বার।

মুনকার-নাকীরের এই সওয়াল-জওয়াব আসলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মৃত্যু মানেই সবকিছুর শেষ নয়। বরং এটি এক অবিনশ্বর জগতের অনন্ত যাত্রার সূচনা, যেখানে সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি হলো দুনিয়ার জীবনে অর্জিত বিশুদ্ধ ঈমান এবং রাসূলের সুন্নাহর প্রতি অবিচল আনুগত্য।

পরিশেষে বলা যায়__

কবরের সেই 'ভাইভা' বা মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি আজ থেকেই নিতে হবে। আমাদের কলব বা হৃদয়কে এমনভাবে গড়া প্রয়োজন যাতে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে না হয়, বরং আমলের নূর যেন জবানকে সচল করে দেয়। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন মূলত সেই চূড়ান্ত পরীক্ষার হলের প্রস্তুতি মাত্র। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা.)-কে আদর্শ হিসেবে মেনে নিয়েছে, তার পুরো জীবনটা সুন্নাহ দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছে,তার জন্য কবরের অন্ধকার ঘরটি হবে জান্নাতের এক টুকরো বাগান এবং প্রশান্তিময় এক বিশ্রামের স্থান।

কবরের আরাম ও নেয়ামতসমূহ:

মানুষ যখন দুনিয়ার মায়া কাটিয়ে কবরের নির্জনতায় নিক্ষিপ্ত হয়, তখন বাহ্যিকভাবে মনে হয় সে এক চরম নিঃসঙ্গতায় হারিয়ে গেল। কিন্তু একজন মুমিন বান্দার জন্য বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। দুনিয়াতে আমরা যখন কোনো আপনজনের বাড়িতে মেহমান হিসেবে যাই, তখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তারা যেভাবে হাসিমুখে আমাদের জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানায়, কবরও তার নেককার বাসিন্দাকে ঠিক সেভাবেই বরণ করে নেয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী, কবর প্রতিদিন মানুষের উদ্দেশ্যে কথা বলে। যখন একজন মুমিন ও নেককার বান্দাকে তার কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে আতঙ্কিত করে না, বরং পরম মমতায় সম্বোধন করে বলে:
"মারহাবান ওয়া আহলান! (তোমাকে স্বাগতম ও সুসংবাদ!) আল্লাহর কসম, আমার পিঠের ওপর দিয়ে যারা বিচরণ করত, তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আজ যখন তুমি আমার অভ্যন্তরীণ জগতে এসেছ, তখন তুমি দেখবে আমি তোমার সাথে কত চমৎকার আচরণ করি এবং কত সুন্দর মেহমানদারির ব্যবস্থা করি।" (রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ২৪৬৭; মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদীস নং ১৩১)।

এই সম্ভাষণটি মুমিনের হৃদয়ে এক অদ্ভুত প্রশান্তি এনে দেয়। যে কবরকে সে দুনিয়াতে ভয় পেত, সেই কবরই এখন তার সবচেয়ে বড় আশ্রয়দাতা ও বন্ধুর মতো আচরণ শুরু করে।

মুফাসসিরগণ এই অভ্যর্থনার এক চমৎকার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:
"আমি তোমাদের মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদের ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় এখান থেকেই তোমাদের বের করে আনব।" (সূরা ত্বহা: ৫৫)।

যেহেতু মানুষ মাটির তৈরি, তাই মাটি হলো মানুষের আদি জননী। একজন মা যেমন তার সন্তানকে দীর্ঘ প্রবাস যাপন বা বিচ্ছেদ শেষে ফিরে পেতে ব্যাকুল থাকেন এবং

সন্তানকে দেখামাত্রই বুকের সাথে জাপটে ধরেন, মাটিও তার নেককার সন্তানকে ঠিক সেভাবেই কাছে টেনে নেয়।

মুফাসসিরগণের মতে, কবরের যে 'চাপ' বা সংকীর্ণতার কথা হাদীসে এসেছে, তা মুমিনের জন্য কোনো শাস্তিমূলক চাপ নয়। বরং এটি হলো মায়ের মমতাভরা আলিঙ্গন। দুনিয়াতে আমরা যখন কোনো প্রিয়জনকে অনেকদিন পর দেখি, তখন যেমন আবেগাপ্লুত হয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরি, কবরও তার নেককার বাসিন্দাকে সেভাবেই মমতার চাপে জড়িয়ে ধরে। ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাঁর 'আত-তাযকিরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই আলিঙ্গনটি মৃত ব্যক্তির দুনিয়াবী ক্লান্তি দূর করে দেয় এবং তাকে এক অনাবিল প্রশান্তি দান করে।

কবর যখন তার মেহমানকে চিনে ফেলে, তখন তার সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। যে কবরের দেয়ালগুলো মাটির তৈরি ছিল, আল্লাহর কুদরতে সেগুলো তখন মুমিনের জন্য এক বিশাল প্রাসাদের মতো প্রশস্ত হতে শুরু করে। কবরের প্রতিটি ধূলিকণা যেন তখন মুমিনের সেবায় নিয়োজিত হয়ে যায়। দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে সেজদা দিয়ে মাটির সাথে কপাল ঘষেছে, আজ সেই মাটিই তাদের কপাল চুম্বন করে তাদের সম্মান জানায়।

এই অভ্যর্থনাটিই হলো বারযাখী জীবনের সেই রাজকীয় সূচনার সংকেত, যা একজন মুমিনকে কিয়ামত পর্যন্ত এক নিরাপদ ও আরামদায়ক আশ্রয়ের গ্যারান্টি দেয়। এটি আমাদের শেখায় যে, যারা আল্লাহর পথে চলে, মাটি এবং আকাশ কেউই তাদের জন্য পর নয়, বরং সবাই তাদের বন্ধু হিসেবে পাশে দাঁড়ায়।
কবরের কঠিন পরীক্ষায় (মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব) যখন একজন মুমিন বান্দা সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়, তখন থেকেই তার পরকালীন রাজকীয় জীবনের আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটে। দুনিয়ার কোনো সম্রাট বা রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনে যেমন লাল গালিচা সংবর্ধনা দেওয়া হয়, মুমিনের জন্য আসমানি জগত থেকে তার চেয়েও কয়েক গুণ বেশি মর্যাদাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

মুমিন বান্দা যখন তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি সঠিকভাবে প্রদান করে, তখন আসমান থেকে এক মহান ঘোষণাকারীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর ফেরেশতাদের সাক্ষী রেখে অত্যন্ত গৌরবের সাথে ঘোষণা করেন:
"আন সাদাকা আবদী, ফাফরিশুহু মিনাল জান্নাহ, ওয়া আলবিসুহু মিনাল জান্নাহ..."
অর্থাৎ: "আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব, তোমরা তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের রাজকীয় পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরের সাথে জান্নাতের একটি সংযোগ স্থাপন করে দাও।"
(রেফারেন্স: মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৮৫৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৫৩)।

এই ঘোষণাটি কেবল একটি আদেশ নয়, বরং এটি হলো দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ-কষ্টের অবসান এবং এক চিরন্তন সুখের রাজত্বের ছাড়পত্র।

দুনিয়াতে একজন মানুষকে যখন বিদায় দেওয়া হয়েছিল, তখন তার পরনে ছিল মাত্র কয়েক টুকরো সাদা সুতির কাফন। সেই কাফনের কাপড়ে কোনো পকেট ছিল না, ছিল না কোনো কারুকাজ। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণার সাথে সাথেই সেই পার্থিব কাফনের রূহানি রূপ বদলে যায়। ফেরেশতারা জান্নাত থেকে অতি সূক্ষ্ম রেশমি কাপড় নিয়ে আসেন, যার সুঘ্রাণ এবং কোমলতা দুনিয়ার কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব।
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে ইঙ্গিত করেছেন যে, মুমিনের শরীর ও রূহ তখন এক স্বর্গীয় আভায় আবৃত হয়ে যায়। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে নিজের জাঁকজমক ত্যাগ করেছিল, আজ কবরের নির্জনতায় তাকে জান্নাতের শাহী পোশাকে সজ্জিত করা হয়। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর কাছে তাঁর প্রিয় বান্দার সম্মান ঠিক কতটা বেশি।

কবরকে বাহ্যিকভাবে আমরা একটি মাটির গর্ত হিসেবে দেখি। কিন্তু আল্লাহর নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যেই সেই কর্কশ মাটি আর মাটির ধর্ম বজায় রাখে না। জান্নাতের বিছানা বিছানোর অর্থ হলো—কবরের সংকীর্ণতা ও মাটির কঠোরতা দূর হয়ে সেখানে জান্নাতের কোমলতা প্রবেশ করা।

কল্পনা করুন, যে জমিনটি ছিল অন্ধকার ও ঠান্ডা, সেখানে জান্নাতী গালিচার পরশ এসে মিশেছে। মুমিন যখন সেই বিছানায় শুয়ে পড়ে, তখন দুনিয়ার জীবনের সমস্ত ক্লান্তি, হাহাকার আর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা এক পলকেই মুছে যায়। মুফাসসিরগণ বলেন, এই বিছানাটি কেবল আরামের জন্য নয়, বরং এটি মুমিনের মর্যাদার প্রতীক। যে জমিনটি তাকে একদিন গিলে ফেলতে চেয়েছিল, আজ সেই জমিনটিই তার জন্য জান্নাতী বিছানা ধারণ করে ধন্য হয়।

এই যে কবরের মধ্যে এই জান্নাতি পোশাক এবং জান্নাতি বিছানা কোনো লটারি বা ভাগ্যের দান নয়, বরং এটি হলো দুনিয়াতে প্রতিটি সিজদা, প্রতিটি নেক আমল, গোসল সাদাকালো, আল্লাহর ভয়ে প্রতিটি ফোঁটা চোখের পানি এবং প্রতিটি সততার বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া 'উপহার'। এই রাজকীয় সজ্জাই মুমিনকে বুঝিয়ে দেয় যে, সামনের জগতটিতে তার জন্য আরও কত বড় বড় বিস্ময় ও নেয়ামত লুকিয়ে রেখেছে।

একজন মুমিন তার ইহকালীন নেমামত গুলো কবরে সাওয়াল যাওয়াবে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকেই ভোগ করতে থাকবে,আর কোনো দূঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করবে না,আর তাকে কাঁদতে হবে না কখনো,হয়তো দুনিয়াতে সে দূর্বল বান্দা ছিলো, কিন্তু কিয়ামত অব্দি সে জান্নাতি নাজ নেয়ামতের মধ্যে এভাবেই ভোগ করতে থাকবে।
কবরের সওয়াল-জওয়াব শেষে মুমিন বান্দার জন্য জান্নাতের বিছানা ও পোশাক নিশ্চিত করার পর যে বিস্ময়কর নেয়ামতটি প্রদান করা হয়, তা হলো জান্নাতের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপন। বাহ্যিক চোখে কবর একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষ মনে হলেও, ঈমানদারের জন্য এটি তখন জান্নাতের একটি সম্প্রসারিত অংশে পরিণত হয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মুমিনের এই অবিচল বিশ্বাসের পুরস্কার সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন:
"নিশ্চয় যারা বলে, ‘আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ’, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, ‘তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো’।"
(সূরা ফুসসিলাত: ৩০)।

মুফাসসিরগণ বলেন, এই সুসংবাদটি কবরে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সরাসরি কার্যকর করা হয়। যখন মুমিন ব্যক্তি কবরের পরীক্ষায় পাশ করে, তখন তাকে কেবল মৌখিকভাবে নয়, বরং চাক্ষুষভাবে জান্নাতের সেই চিরস্থায়ী সুখের দৃশ্য দেখানো হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই পর্যায়টির বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, কবরের এক প্রান্ত দিয়ে জান্নাতের একটি দরজা বা জানালা খুলে দেওয়া হয়। এর ফলে দুটি বড় নেয়ামত সরাসরি কার্যকর হয়:

সেই জানালা দিয়ে জান্নাতের কস্তুরী ও আম্বরের সুঘ্রাণ এবং অত্যন্ত শীতল ও আরামদায়ক হাওয়া কবরের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। দুনিয়ার তপ্ত মরুভূমিতে যেমন শীতল বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে দেয়, কবরের নির্জনতায় জান্নাতের এই হাওয়া মুমিনের রূহকে এক জান্নাতী আবেশে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় সেই জানালার মধ্য দিয়ে মুমিনকে জান্নাতে তার জন্য বরাদ্দকৃত ঘর, প্রাসাদ এবং নেয়ামতগুলো দেখানো হয়।

(রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৬)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর কালজয়ী গ্রন্থ 'কিতাবুর রূহ'-এ এই জানালার তাৎপর্য নিয়ে এক গভীর ও চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই জানালাটি কেবল হাওয়া আসার পথ নয়, বরং এটি হলো মুমিনের জন্য 'ভবিষ্যতের আয়না'। মুমিন যখন তার জান্নাতী মাকাম বা ঘরটি দেখতে পায়, তখন তার আনন্দ ও উত্তেজনা সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বর্ণনা করেন, মুমিন ব্যক্তি সেই সৌন্দর্যে এতটাই বিমোহিত হয়ে পড়ে যে, সে তার বর্তমান আরামের চেয়েও সেই চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সে তখন উচ্চস্বরে বলতে থাকে:

"রব্বি আক্বিমিস সা'আহ! রব্বি আক্বিমিস সা'আহ! হাত্তা আরজি'আ ইলা আহলি ওয়া মালি।"

অর্থাৎ: "হে আমার পালনকর্তা! দ্রুত কিয়ামত কায়েম করুন! দ্রুত কিয়ামত কায়েম করুন! যাতে আমি দ্রুত জান্নাতে আমার পরিবার-পরিজন এবং আমার ধন-সম্পদের কাছে ফিরে যেতে পারি।"

এই পর্যায়ে মুমিনের আকুতি প্রমাণ করে যে, কবরের জগতটি তার জন্য শাস্তির নয়, বরং এক দীর্ঘ প্রতীক্ষার আনন্দময় কক্ষ। সে জানে যে কিয়ামত হওয়া মানেই হলো সেই জান্নাতে প্রবেশ করা যা সে জানালার ওপার থেকে দেখছে। দুনিয়াতে মানুষ যেমন বিদেশ থেকে বাড়িতে ফেরার জন্য ব্যাকুল থাকে, মুমিনও তখন জান্নাতের সেই রাজকীয় প্রাসাদে ফেরার জন্য ছটফট করতে থাকে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আরও বলেন, এই জানালার মাধ্যমে আসা জান্নাতী নূর মুমিনের কবরকে আলোকিত করে রাখে। যার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেলেও মুমিনের কাছে মনে হয় সে যেন মাত্র কয়েক মুহূর্ত হলো সেখানে অবস্থান করছে।

সাধারণত কবরের কথা ভাবলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে একটি সংকীর্ণ, অন্ধকার এবং দমবন্ধ করা গর্তের চিত্র। কিন্তু একজন ঈমানদার বান্দার জন্য এই ধারণাটি সম্পূর্ণ বদলে যায়।

মুনকার-নাকীরের সওয়াল-জওয়াব শেষে যখন মুমিন বান্দা সফল হয়, তখন ফেরেশতাদের নির্দেশে তার কবরকে চারিদিকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে এসেছে:
"মুমিনের কবরকে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সত্তর হাত (৭০ হাত) প্রশস্ত করে দেওয়া হয়।"
(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ১০৭১; সহীহ ইবনে হিব্বান)।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, এই প্রশস্ততা কেবল সত্তর হাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং মুমিনের দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত তার কবরকে বিস্তৃত করে দেওয়া হয়। এটি আসলে মুমিনের রূহের স্বাধীনতার প্রতীক। দুনিয়ার সংকীর্ণ জীবনে যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিজেদের নফসের ওপর নিয়ন্ত্রণ এনেছিল, আজ কবরের এই প্রশস্ততা তাদের সেই ত্যাগের প্রতিদান। মাটির সেই দেয়ালগুলো তখন আর তাকে চেপে ধরে না, বরং এক বিশাল মাঠ বা প্রাসাদের মতো তাকে স্বাধীনতা দান করে।

কবরকে বলা হয় 'আলোহীন ঘর'। কিন্তু মুমিনের জন্য আল্লাহ সেখানে এক ঐশী আলোর (নূর) ব্যবস্থা করেন। এই আলো কোনো পার্থিব বিদ্যুৎ বা মোমবাতির আলো নয়, বরং এটি হলো তার নেক আমলের নূর। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, কবরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে দূর করতে মুমিনের দুনিয়াবী ইবাদতগুলো প্রদীপের মতো জ্বলে ওঠে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতদের ওজুর অঙ্গগুলো নূরে ঝলমল করবে। সেই একই নূর কবরের অন্ধকার দূর করতে সাহায্য করে। যারা নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়েছে এবং গভীর রাতে তাহাজ্জুদে কপাল ঘষেছে, তাদের সেই সিজদার জায়গাগুলো থেকে নূরের ফোয়ারা ছুটতে থাকে।

বিশেষ করে সূরা মুলক এবং কুরআনের নিয়মিত তিলাওয়াত কবরের চারপাশকে এমনভাবে আলোকিত করে রাখে যে, মুমিনের কাছে মনে হয় সে দিনের প্রখর সূর্যের আলোতে অবস্থান করছে।

এই নূর এবং প্রশস্ততা কেবল দেখার বিষয় নয়, এটি অনুভবের বিষয়। কবরের প্রশস্ততা মুমিনের মনে এক ধরণের রাজকীয় ভাব এনে দেয়। দুনিয়াতে সে হয়তো খুব ছোট ঘরে থাকতো, কিন্তু কবরে সে এক সুবিশাল সম্রাজ্যের অধিপতি। এই আলো তাকে ফেরেশতাদের সঙ্গ উপভোগ করতে এবং জান্নাতের জানালা দিয়ে আসা দৃশ্যগুলো স্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করে।
ইমাম কুরতুবী (রহ.)-এর মতে, এই নূর মুমিনের রূহকে প্রফুল্ল রাখে যাতে কিয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময় তার কাছে এক মুহূর্তের মতো মনে হয়। এটি আল্লাহর সেই বিশেষ রহমত, যা কেবল তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্যই সংরক্ষিত।

পার্থিব জীবনে মানুষ যতই একা থাকুক না কেন, চারপাশের সমাজ বা কোলাহল আপনজনেরা তাকে পুরোপুরি নিঃসঙ্গ হতে দেয় না। কিন্তু কবরের প্রথম রাতটি মানুষের জীবনের এমন এক মুহূর্ত, যেখানে অতি প্রিয় সন্তান বা জীবনসঙ্গীও মাটির নিচে একা ফেলে চলে যায়। চারপাশের সেই সুনসান নীরবতা আর একাকীত্বে যখন

মানুষের বুক ফেটে যেতে চায়, ঠিক তখনই মুমিন বান্দার জীবনে শুরু হয় এক ঐশী বন্ধুত্বের অধ্যায়।

ইমাম গাজালী (রহ.) তাঁর 'এহয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থে এবং ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে কবরের একাকীত্ব দূর হওয়ার এক অদ্ভুত ও সুন্দর চিত্র তুলে ধরেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস অনুযায়ী, কবরের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মুমিনের সামনে অত্যন্ত সুন্দর চেহারা বিশিষ্ট, সুবাসিত পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এসে উপস্থিত হবে। তাকে দেখা মাত্রই মুমিনের চোখ জুড়িয়ে যাবে এবং তার মনের সমস্ত ভয় উধাও হয়ে যাবে।

মুমিন ব্যক্তি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করবে, "কে তুমি? তোমার সুন্দর চেহারা তো কেবল কল্যাণই বয়ে আনতে পারে!" তখন সেই আলোকময় আগন্তুক মৃদু হেসে উত্তর দেবে:

"আনা আমালুকাস সালিহ... আমি তোমার সেই সৎ আমল। দুনিয়াতে তুমি যে কষ্ট করে সালাত আদায় করতে, তীব্র গরমে রোজা রাখতে, মানুষের অগোচরে দান করতে আর বিপদে ধৈর্য ধরতে—আমি আজ সেই সব আমলেরই একটি জীবন্ত রূপ।"

(রেফারেন্স: মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৮৫৫৭)।

সেই নূরানি সাথী মুমিনকে আশ্বস্ত করে বলবে, "আজ তোমার আর কোনো ভয় নেই, কোনো একাকীত্ব নেই। কিয়ামত পর্যন্ত আমি এখানে তোমার সাথে গল্প করব এবং তোমার একাকীত্বের সঙ্গী হয়ে থাকব।"

আমলের এই অবয়বের পাশাপাশি আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারাও মুমিনকে ঘিরে রাখেন। তারা মুমিনের পাশে বসে তাকে জান্নাতের নানা নেয়ামতের সুসংবাদ দিতে থাকেন। দুনিয়াতে মানুষ যখন কোনো গভীর সংকটে পড়ে, তখন কোনো আপনজন এসে মাথায় হাত বুলিয়ে অভয় দিলে যেমন শান্তি লাগে, ফেরেশতারাও ঠিক তেমনিভাবে মুমিনের অন্তরকে শান্ত করেন। তারা তাকে মনে করিয়ে দেন যে, দুনিয়ার দুঃখের দিন শেষ হয়েছে এবং এখন কেবলই আরামের অনন্তকাল।

এই সাধারণ নেয়ামতের পাশাপাশি যারা আল্লাহর দ্বীনকে ভালোবেসে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, অর্থাৎ শহীদদের জন্য আল্লাহর আতিথেয়তা আরও অনন্য ও রাজকীয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) শহীদদের রূহের বারযাখী জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

"শহীদদের রূহ সবুজ রঙের পাখির পেটের ভেতরে (বা দেহে) অবস্থান করে। জান্নাতের সর্বত্র তারা স্বাধীনভাবে উড়ে বেড়ায় এবং জান্নাতের ফলমূল আহার করে। এরপর তারা আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপসমূহে এসে আশ্রয় নেয়।"

(রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৭)।

সাধারণ মুমিনের রূহ যেখানে কবরের গণ্ডির সাথে বারযাখী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে, সেখানে শহীদদের রূহকে আল্লাহ দুনিয়ার কবরেই জান্নাতী স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করান।

এই আলোচনা টুকু থেকে পরিষ্কার বোঝা যচ্ছে যে,যারা আল্লাহর পথে চলেন, তাদের জন্য মৃত্যু কোনো অন্ধকার বা ভয়ের শেষ নয়। দুনিয়ার মানুষ যেটাকে 'একাকীত্ব' ভেবে চোখের পানি ফেলে, একজন মুমিনের জন্য সেটা আসলে ফেরেশতা আর নিজের ভালো কাজের সাথে এক আনন্দের মিলনমেলা। এই স্বর্গীয় ভালোবাসার কারণেই কবরের হাজার হাজার বছর একজন ঈমানদারের কাছে মাত্র কয়েক মুহূর্তের পরম আনন্দের মতো মনে হয়।

কবরের সমস্ত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর, জান্নাতের পোশাক, বিছানা আর জানালার নেয়ামতগুলো বুঝিয়ে দিয়ে ফেরেশতারা মুমিন বান্দাকে চিরস্থায়ী উপহার দেন। সেই উপহারটি হলো এক পরম প্রশান্তির ঘুম। দুনিয়ার জীবনের সমস্ত ক্লান্তি, হাহাকার, রোগ-শোক আর চড়াই-উতরাই পার হয়ে আসা ক্লান্ত বান্দাকে ফেরেশতারা তখন পরম মমতা নিয়ে এক দীর্ঘ ও গভীর ঘুমের দিকে আহ্বান জানান।

মুনকার ও নাকীর যখন দেখেন যে বান্দা তার রবের পরীক্ষায় পূর্ণভাবে সফল হয়েছে, তখন তাদের দায়িত্ব শেষ হয়। তারা তখন অত্যন্ত মৃদু এবং স্নেহ জড়ানো কণ্ঠে মুমিনকে লক্ষ্য করে বলেন:

"নাম কানাওমাতিল আরূসিল্লাযী লা ইউক্বিযুহু ইল্লা আহাব্বু আহলিহী ইলাইহি..."
অর্থাৎ: "তুমি এখন ঠিক সেই নববধূর মতো নিশ্চিন্তে ঘুমাও, যাকে তার পরিবারের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি ছাড়া আর কেউ গভীর ঘুম থেকে জাগায় না।"
(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ১০৭১; মিশকাতুল মাসাবীহ)।

এই একটিমাত্র বাক্য মুমিনের কবরের চিরন্তন রূপ বদলে দেয়। মৃত্যুর ভয়াল থাবা থেকে বেঁচে ফেরা মানুষটি তখন এক পরম নিরাপত্তার চাদরে নিজেকে আবিষ্কার করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মুমিনের এই ঘুমকে বোঝাতে গিয়ে কেন 'নববধূর' উপমা দিলেন, তার পেছনে এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে। বাসর ঘরে একজন নববধূ যখন প্রবেশ করে, তখন তার পেছনে ফেলে আসা জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট আর একাকীত্বের ভয় কেটে যায়। সে এক পরম ভরসার মানুষের বুকে মাথা রেখে এমন এক নিশ্চিন্ত ঘুমে মগ্ন হয়, যেখানে কোনো চোর-ডাকাতের ভয় থাকে না, কোনো ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা থাকে না। সে জানে, তার পাহারাদার তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি।
ঠিক তেমনি, মুমিন বান্দা যখন তার আমলের আলোতে জান্নাতের বিছানায় শোয়, তখন সে জানে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার পাহারাদার। দুনিয়াতে যে মানুষটি একটু শান্তিতে ঘুমানোর জন্য কত দামী বিছানা কিনেছে, কত বিলাসবহুল এসি রুম তৈরি করেছে, কিন্তু মনের অস্থিরতায় রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছে—আজ কবরের এই মাটির বিছানায় তার সেই রূহানি আরাম মিলবে, যা দুনিয়ার কোনো কোটি টাকার রাজপ্রাসাদও তাকে দিতে পারেনি।

কিয়ামত হতে কত হাজার বছর বাকি, তা নিয়ে মুমিনের কোনো মাথাব্যথা থাকে না। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'কিতাবুর রূহ' গ্রন্থে লিখেছেন, যখন একজন ঈমানদার এই প্রশান্তির ঘুমে মগ্ন হয়, তখন আল্লাহর কুদরতে তার কাছে সময়ের হিসাবটাই বদলে যায়। জান্নাত থেকে আসা শীতল হাওয়া আর নূরের আবেশে তার চোখ এমনভাবে জুড়ে আসে যে, সুদীর্ঘ হাজার বছরও তার কাছে মাত্র কয়েক মিনিটের একটি হালকা ঘুমের মতো মনে হয়।

যখন ইসরাফিল (আ.)-এর শিঙার আওয়াজে কিয়ামত কায়েম হবে এবং সব মানুষ কবর থেকে জেগে উঠবে, তখন মুমিন বান্দা যেন কেবল এক চমৎকার ঘুম থেকে চোখ কচলাতে কচলাতে উঠবে। সে অবাক হয়ে বলবে, "হায়! আমাদের এই আরামের ঘুম থেকে কে জাগাল?" সে ভাবতেই পারবে না যে মাটির নিচে সে হাজার বছর কাটিয়ে এসেছে।

এই আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, আল্লাহর বাধ্যগত বান্দাদের জন্য কবর কোনো শাস্তির কারাগার নয়। যারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহর ভালোবাসায় নিজেদের রাতগুলোকে সেজদায় জাগ্রত রেখেছে, আল্লাহ কবরের দীর্ঘ রাতগুলোকে তাদের জন্য এক পরম আরামের বাসর ঘরে পরিণত করে দেন। এই ঘুমই হলো চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশের আগের সেই রাজকীয় বিশ্রাম, যা কেবল একজন মুমিনের ভাগ্যেই জোটে।
আল্লাহ আমাদের দুনিয়ার বাকি জীবন টুকু তার জন্য বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন,বেশির থেকে বেশি নেক আমল এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই যেনো আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয় সেভাবেই জীবনযাপন করার তাওফীক দান করুন।
আমিন।

কবরের আজাব ও এর কারণসমূহ:

কবরের আজাব বা বারযাখী জীবনের শাস্তি কেবল কোনো কাল্পনিক ভয় নয়, বরং এটি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এক ভয়ংকর বাস্তবতা। অনেকেই মনে করেন কবরের আজাবের কথা কেবল হাদীসেই আছে, কিন্তু পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এর স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ দিয়েছেন ফেরাউনের ঘটনার মাধ্যমে। ইরশাদ হয়েছে:
"তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যা আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়। আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে (সেদিন আদেশ করা হবে), ফেরাউন দলকে কঠিনতর আজাবে প্রবেশ করাও।" (সূরা গাফির/মুমিন: ৪৬)।

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহ.) তাঁর তাফসীরে লিখেছেন, এই আয়াতটি কবরের আজাব সত্য হওয়ার সবচেয়ে বড় দলিল। কারণ কিয়ামত হওয়ার আগেই তাদের সকাল-সন্ধ্যা আগুনের মুখোমুখি করা হচ্ছে, যা মূলত বারযাখী জীবন বা কবরের আজাব।

আল্লাহ তা'আলা মদীনার মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন:
"আমি তাদেরকে দুই বার শাস্তি দেব, অতঃপর তারা এক মহা আজাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা তাওবা: ১০১)।

ইমাম তাবারী (রহ.) সালাফদের সূত্র দিয়ে লিখেছেন, এখানে প্রথম শাস্তি হলো দুনিয়ার জীবনে অপমান এবং দ্বিতীয় শাস্তিটি হলো 'কবরের আজাব'। এরপর কিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত শাস্তি।

যখন কোনো পাপিষ্ঠ বা কাফের ব্যক্তি কবরের তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়, তখন আসমান থেকে ঘোষণা আসে— "সে মিথ্যা বলেছে, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও।" এরপর কিয়ামত পর্যন্ত তার ওপর বিভিন্ন ধরণের আজাব চাপিয়ে দেওয়া হয়। হাদীস শরীফে সেই আজাবের ধরণগুলো বিস্তারিত এসেছে:

কবরে রাখার পরপরই পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে কবর এমন জোরে চাপ দেয় যে তার একদিকের পাঁজর বা বুকের হাড্ডি অন্যদিকের পাঁজরের ভেতর ঢুকে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, কবরের এই চাপ থেকে কেউ রেহাই পাবে না, যদি কেউ পেত তবে সা'দ ইবনে মুয়াজ (রা.) পেতেন, যার মৃত্যুতে আরশ কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু তাকেও কবরের হালকা চাপের মুখোমুখি হতে হয়েছে। পাপিষ্ঠদের জন্য এই চাপ হবে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। (মুসনাদে আহমাদ)।

ঈমানদারের জন্য যেমন জান্নাতের জানালা খোলে, অপরাধীদের জন্য তেমনি জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সেখান থেকে জাহান্নামের তীব্র গরম হাওয়া এবং বিষাক্ত ধোঁয়া তার কবরে আসতে থাকে। তার পুরো শরীরকে জাহান্নামের আগুনের পোশাক পরিয়ে মাটির বিছানাকে আগুনের বিছানায় রূপান্তর করা হয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৫৩)।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কবরে এমন কিছু বিষাক্ত সাপ ও বিচ্ছু নিযুক্ত করা হয়, যার বিষের তীব্রতা দুনিয়ার সাপের মতো নয়। হাদীসে এসেছে, কবরে অপরাধীর জন্য ‘নিরানব্বইটি তিনীন’ (বিশাল বিষাক্ত সাপ) নিয়োজিত করা হয়। এই সাপগুলো কিয়ামত পর্যন্ত তাকে কামড়াতে ও খুবলাতে থাকবে। এই সাপের বিষ এত তীব্র যে, এদের একটি সাপ যদি দুনিয়াতে একবার ফুসকার দেয়, তবে কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার মাটিতে কোনোদিন আর একটা ঘাসও জন্মাবে না। (সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ২৪৬৭)।

অপরাধী ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কবরের আজাবের অন্যতম ভয়ংকর রূপ হলো এই বিষাক্ত কীটপতঙ্গ, বিশেষ করে সাপের দংশন। হাদীস শরীফে এই বিশেষ সাপ বা সাপের দলকে বোঝাতে ‘তিনীন’ (تِنِّين) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি কেবল কোনো সাধারণ সাপ নয়, বরং এর ভয়াবহতা দুনিয়ার যেকোনো বিষাক্ত প্রাণীর কল্পনাতীত।

আরবি ভাষায় 'তিনীন' বলতে এমন এক বিশাল আকৃতির সাপকে বোঝানো হয়, যা অত্যন্ত ভয়ংকর, বিষাক্ত এবং যার ফণা বা অবয়ব সাধারণ সাপের চেয়ে সম্পূর্ণ

আলাদা। ইমাম কুরতুবী (রহ.) তাঁর 'আত-তাযকিরা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, 'তিনীন' হলো সাপের এমন এক প্রজাতি, যার একেকটি ফণায় সাতটি করে মাথা থাকে।
মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে তিরমিজির বর্ণনা অনুযায়ী, পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কবরে 'নিরানব্বইটি তিনীন' নিযুক্ত করা হয়। এই নিরানব্বইটি সাপ কিয়ামত পর্যন্ত একবিন্দু সময় নষ্ট না করে বিরতিহীনভাবে অপরাধীকে দংশন করতে থাকে, তার মাংস খুবলাতে থাকে এবং নিজেদের ধারালো নখ ও দাঁত দিয়ে তার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করতে থাকে। (রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ২৪৬৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১১৩১৪)।

এই সাপের বিষের তীব্রতা ও ভয়াবহতা বোঝাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি অভাবনীয় উপমা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:
"এই তিনীন বা সাপের বিষ এতটাই মারাত্মক যে, এদের মধ্য থেকে মাত্র একটি সাপ যদি এই দুনিয়ার বুকে এসে একটিমাত্র ফুঁ বা নিঃশ্বাস ছাড়ে, তবে কেয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীর বুকে আর কোনো সবুজ ঘাস বা উদ্ভিদ জন্মাবে না। পুরো পৃথিবী উর্বরতা হারিয়ে চিরদিনের জন্য মরুভূমি হয়ে যাবে।"

আসুন, এই গভীর সত্যটিকে দুনিয়ার সাপের বিষের সাথে তুলনা করে বিশ্লেষণ করি: দুনিয়ার সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ (যেমন ব্ল্যাক মাম্বা বা কিং কোবরা)-এর এক ফোঁটা বিষে হয়তো কয়েক সেকেন্ডে কিছু মানুষের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু তার বিষের প্রভাব মাটিতে বা উদ্ভিদের ওপর পড়ে না। সাপের কামড়ে মানুষ মারা গেলেও মাটি তার উর্বরতা হারায় না, ঘাস মরে যায় না। অথচ কবরের 'তিনীন'-এর বিষের তীব্রতা এত বেশি যে, মাটির জীবনকেও চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

দুনিয়ার সাপ একবার কামড় দিয়ে বিষ ঢেলে চলে যায়। কিন্তু কবরের এই সাপগুলো কোনো বিরতি নেয় না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত অবিরাম কামড়াতে থাকে। আল্লাহর নির্দেশে মৃত ব্যক্তির শরীর বিষে নীল হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, আবার আল্লাহর কুদরতে শরীরটি জোড়া লেগে যায় এবং সাপগুলো পুনরায় দংশন শুরু করে।

মুফাসসিরগণ বলেন, এই আজাবটি কেবল শারীরিক যন্ত্রণার নয়, এটি এক চরম মানসিক আজাবও বটে। সংকীর্ণ অন্ধকার ওই কবরে নিরানব্বইটি বিশালাকার সাপের হিসহিস শব্দ, তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের গরম হাওয়া এবং ধেয়ে আসার দৃশ্য দেখেই অপরাধী আতঙ্কে বারবার মূর্ছা যাবে। দুনিয়াতে যারা আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত পেয়েও তাঁর হুকুম অমান্য করেছিল এবং অহংকারে মাটিতে পা ফেলে চলত, আজ সেই মাটির বুকেই এই বিষাক্ত প্রাণীরা তাদের অহংকার চূর্ণ করে দেয়।

এছাড়া কবরে অপরাধীর আজাব কার্যকর করার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যার হাতে থাকে এক বিশাল লোহার হাতুড়ি। এই হাতুড়িটি এত ভারী যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জিন মিলেও তা নাড়াতে পারবে না। সেই হাতুড়ি দিয়ে যখন মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়, তখন সে এত জোরে চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ছাড়া সৃষ্টির সমস্ত জীবজন্তু সেই আওয়াজ শুনতে পায়। আঘাতের চোটে সে মাটির সাথে মিশে যায়, আবার আল্লাহ তাকে আগের অবয়বে ফিরিয়ে আনেন এবং আবারও আঘাত করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৪)।

কবরের আজাব বা বারযাখী জীবনের এই ভয়ানক শাস্তিগুলো কোনো কারণ ছাড়া চাপিয়ে দেওয়া হয় না। বরং মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনে যে সমস্ত অপরাধকে খুব ছোট বা সাধারণ মনে করে অবহেলা করে, সেই সুনির্দিষ্ট পাপগুলোর কারণেই কবরের এই কঠিন আজাব নির্ধারিত হয়। নিচে সহীহ হাদীসের আলোকে কবরের আজাবের প্রধান কারণসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. প্রস্রাবের পবিত্রতা না নেওয়া ও চোগলখুরী (পরনিন্দা করা)

আমাদের সমাজে অনেকেই পবিত্রতা অর্জন এবং মানুষের সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষার বিষয়টিকে খুব হালকাভাবে দেখে। অথচ এই দুটি কাজের কারণেই বেশিরভাগ মানুষের কবরের আজাব হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ (সা.) দুটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং সাহাবীদের বললেন, "এই দুই কবরবাসীকে আজাব

দেওয়া হচ্ছে। তবে কোনো বড় (কঠিন) বিষয়ের জন্য তাদের আজাব দেওয়া হচ্ছে না (যা পরিহার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল)।" এরপর রাসূল (সা.) আজাবের কারণ স্পষ্ট করে দিলেন:
প্রথম ব্যক্তি: সে দুনিয়াতে চোগলখুরী করত। অর্থাৎ, একজনের গোপন কথা বা নিন্দা অন্যজনের কাছে গিয়ে লাগাত, যাতে তাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি: সে প্রস্রাব করার পর ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করত না। প্রস্রাবের ছিটা থেকে নিজের শরীর ও কাপড় বাঁচাত না এবং অলসতা করে অপবিত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াত।
(রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯২)।

২. মিথ্যা কথা বলা এবং গুজব ছড়ানো

বর্তমান যুগে প্রযুক্তি ও মুখের কথার মাধ্যমে মিথ্যা এবং গুজব ছড়ানো খুব সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু কবরে এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর।

সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর একটি সত্য স্বপ্নের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, তিনি দেখেছেন এক ব্যক্তিকে চিৎ করে শুইয়ে রাখা হয়েছে। আর একজন ফেরেশতা লোহার একটি বড় আঁকড়া বা শলাকা দিয়ে তার একপাশের চোয়াল টেনে ধরে মাথার পেছন পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলছে। এরপর অন্যপাশের চোয়ালটি যখন একইভাবে ছিঁড়তে যায়, তখন আগের পাশটি আবার ভালো হয়ে যায়। এভাবে বারবার তার ওপর শাস্তি চলছে।

জিবরাঈল (আ.) এর কারণ হিসেবে রাসূল (সা.)-কে জানান— এই ব্যক্তি দুনিয়াতে সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা কথা বা গুজব ছড়াত, যা নিমেষেই সারা দুনিয়ায় বা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কিয়ামত পর্যন্ত তার কবরে এই বিভীষিকাময় শাস্তি চলতে থাকবে। (রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৭)।

৩. ফরজ নামাজে অলসতা ও কুরআন অবমাননা

কুরআন মুখস্থ বা শিক্ষা করার পর তার ওপর আমল না করা এবং অলসতা করে নামাজ কাজা করা অত্যন্ত বড় অপরাধ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ওই একই দীর্ঘ স্বপ্নের হাদীসে আরও একটি দৃশ্য দেখেন। তিনি দেখেন, এক ব্যক্তি মাটির ওপর শুয়ে আছে, আর একজন ফেরেশতা এক বিশাল পাথর হাতে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ফেরেশতাটি পূর্ণ শক্তিতে সেই পাথরটি ওই শায়িত ব্যক্তির মাথায় ছুঁড়ে মারছে। পাথরের আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে
তার মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ বা থেঁতলে যাচ্ছে। পাথরটি যখন গড়িয়ে দূরে চলে যায়, ফেরেশতা সেটি কুড়িয়ে আনার মাঝেই মাথাটি আবার আগের মতো জোড়া লেগে ভালো হয়ে যায়। ফেরেশতা আবার এসে পাথর মারে।
জিবরাঈল (আ.) এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন— এই ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করার পর তা অবহেলা করে ছেড়ে দিয়েছিল (তার বিধান অনুযায়ী আমল করেনি) এবং ফরজ নামাজের সময় অলসতা করে ঘুমিয়ে থাকত (নামাজ কাজা করত)। (রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৭)।

৪. সুদ খাওয়া এবং ব্যভিচারে (জেনা) লিপ্ত হওয়া

পার্থিব লোভ এবং অবৈধ শারীরিক লালসা মানুষকে কবরের আজাবের দিকে ঠেলে দেয়। রাসূল (সা.)-এর হাদীসে এই দুই পাপের শাস্তি এভাবে এসেছে:

সুদখোরদের শাস্তি: সুদের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কবরে রক্তের একটি নদীতে সাঁতার কাটানো হয়। সেই নদীর তীরে একজন ফেরেশতা অনেকগুলো পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সুদখোর ব্যক্তি যখন সাঁতার কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে নদীর তীরে আসতে চায়, তীরের ফেরেশতা তখন তার মুখ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড জোরে পাথর ছুঁড়ে মারে। পাথরের আঘাতে তার মুখ ভেঙে যায় এবং সে আবার ছিটকে নদীর মাঝখানে চলে যায়। কিয়ামত পর্যন্ত তার এই যাতনা চলতে থাকে।

ব্যভিচারী বা জেনাকারীদের শাস্তি: যারা বিয়ের বাইরে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতো, সেই সব নারী ও পুরুষদের কবরে এক বিশাল তন্দুর চুল্লির ভেতর রাখা হয়। এই চুল্লির ওপরের মুখটি সংকীর্ণ কিন্তু নিচের অংশটি অনেক প্রশস্ত। এর ভেতর নগ্ন বা উলঙ্গ অবস্থায় পাপী নারী-পুরুষরা চিল্লাচিল্লি করতে থাকে। যখন নিচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ওপরে উঠে আসে, তখন তারা আগুনের চোটে চিৎকার করতে করতে চুল্লির মুখের কাছে চলে আসে। আবার আগুন একটু কমে গেলে তারা নিচে তলায় নেমে যায়। (রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭০৪৭)।

৫. গীবত করা এবং মানুষের সম্মানহানি

যারা মানুষের সামনে বা পেছনে তার নামে বদনাম করে বেড়ায় এবং মানুষের সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, কবরে তাদের জন্য এক লাঞ্ছনাকর শাস্তি অপেক্ষা করছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) মিরাজের রাতে একদল লোককে দেখতে পান, যাদের নখগুলো ছিল খাঁটি তামার তৈরি। তারা সেই বিষাক্ত ও ধারালো তামাটে নখ দিয়ে নিজেদের মুখ এবং বুকের চামড়া ও মাংস আঁচড়ে আঁচড়ে ক্ষত-বিশত করছে এবং ছিঁড়ে ফেলছে। রাসূল (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এরা কারা?" জিবরাঈল (আ.) বললেন, "এরা হলো সেই সব মানুষ, যারা দুনিয়াতে মানুষের গীবত করত (পেছনে সমালোচনা করত) এবং মানুষের সম্মানহানি করত।" (রেফারেন্স: সুনানে আবু াউদ, হাদীস নং ৪৮৭৮)।

৬. আমানতের খেয়ানত এবং গনীমতের মাল বা সরকারি সম্পদ আত্মসাৎ

সাধারণ মানুষের হক নষ্ট করা কিংবা রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি বা আত্মসাৎ করা কবরের আজাবের অন্যতম বড় কারণ। অনেকে মনে করেন জনগণের বা সরকারের সম্পদ আত্মসাৎ করলে কেউ দেখছে না, কিন্তু কবরে এর শাস্তি সাথে সাথেই শুরু হয়ে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, খায়বারের যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি তীরের আঘাতে মারা যান। সাহাবীগণ অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, "তাকে সুসংবাদ দিন, সে তো জান্নাতী শাহাদাত

লাভ করেছে!" কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের এই কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং বললেন:
"কখনোই নয়! সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, খায়বারের যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল বণ্টন করার আগেই সে যে একটি চাদর চুরি করেছিল—সেই চাদরটিই আজ তার কবরে আগুন হয়ে দাউদাউ করে জ্বলছে।"
(রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৩৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪)।

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, আমানতের খেয়ানত বা অন্যের হক নষ্ট করা কত বড় অপরাধ। একটি সামান্য চাদর অন্যায়ভাবে নেওয়ার কারণে যদি একজন যোদ্ধার কবরে আগুন জ্বলে উঠতে পারে, তবে যারা কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করে, মানুষের আমানত গ্রাস করে বা সরকারি সম্পদ চুরি করে, তাদের কবরের অবস্থা কত ভয়াবহ হবে!

৭. ঋণগ্রস্ত বা কর্জদার অবস্থায় মারা যাওয়া

দুনিয়াতে মানুষের কাছ থেকে ঋণ বা ধার নেওয়ার পর তা পরিশোধ না করে অবহেলা করা এবং ওই অবস্থাতেই মারা যাওয়া কবরের আজাব ও বন্দিদশার বড় কারণ। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর রাস্তায় শহীদও হন, তবুও তার ঋণ মাফ হয় না।

রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের বলতেন, কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তার রূহ কবরে ঝুলন্ত ও বন্দি অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে সেই ঋণ পরিশোধ করা হয়। একবার এক সাহাবীর জানাজা পড়ার সময় রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "তার কি কোনো ঋণ আছে?" সাহাবীগণ বললেন, "হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল, তার দুই দিনার ঋণ আছে।" তখন রাসূল (সা.) বললেন, "তাহলে তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাজা পড়ে নাও (আমি পড়ব না)।"

পরবর্তীতে হযরত আবু কাতাদা (রা.) যখন দায়িত্ব নিয়ে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই ঋণের দায়িত্ব আমি নিলাম।" তখন রাসূল (সা.) তার জানাজা পড়ালেন। পরদিন

যখন আবু কাতাদা (রা.) ঋণটি শোধ করে এসে রাসূল (সা.)-কে জানালেন, তখন রাসূল (সা.) বললেন:
"আল-আনা বারদাত জিলদুহু..." অর্থাৎ, "এতক্ষণে ওই মৃত ব্যক্তির চামড়া বা শরীর কবরে শীতল হলো।"
(রেফারেন্স: মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৪৫৮৭; সুনানে বায়হাকী)।

এই ঘটনাটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষের পাওনা বা ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কবরের আজাব ও অস্বস্তি দূর হয় না। এটি বাহ্যিক কোনো মারধর না হলেও রূহের জন্য এক তীব্র বন্দিত্ব ও আজাব।

৮. অহংকার, লোকদেখানো আভিজাত্য এবং দাম্ভিকতা

যারা দুনিয়াতে নিজেদের অর্থ, ক্ষমতা বা রূপের অহংকারে মাটিতে পা ফেলে চলত এবং সাধারণ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করত, কবরে তাদের এই অহংকার চূর্ণ করে দেওয়া হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ববর্তী জামানার এক ব্যক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন:
"এক ব্যক্তি তার চমৎকার দুই চাদর পরে চুল আঁচড়ে অত্যন্ত অহংকারী ও দাম্ভিকতার সাথে হেঁটে যাচ্ছিল। সে নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই মুগ্ধ হচ্ছিল। হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা তাকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিলেন। এখন সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে এভাবে ধসে যেতেই থাকবে এবং ছটফট করতে থাকবে।"
(রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০৮৮)।

অহংকার কেবল আল্লাহর চাদর। যে বান্দা দুনিয়াতে এই অহংকার নিয়ে চলে, কবর তাকে চিনে ফেলে এবং তার ওপর আল্লাহর গজব নাজিল হয়। এই আজাবটি হলো কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে ক্রমশ গভীরে তলিয়ে যাওয়া, যা এক চরম মানসিক ও শারীরিক যাতনা।

৯. এতিমের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করা

এতিম বা অসহায় শিশুদের সম্পদ বা টাকা-পয়সা ধোঁকা দিয়ে বা জোরপূর্বক আত্মসাৎ করা অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ। পবিত্র কুরআনেই আল্লাহ এর ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন:

"নিশ্চয় যারা এতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করে, তারা মূলত নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করছে এবং খুব শীঘ্রই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।"
(সূরা আন-নিসা: ১০)।

মুফাসসিরগণ বলেন, এই আগুন পরকালের চূড়ান্ত জাহান্নামের আগেই কবরের জীবনেই তার পেটের ভেতর দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে। কবরের অন্ধকার কুঠুরিতে তার সম্পূর্ণ পেট আগুনের কুন্ডলীতে পরিণত হয় এবং সে তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।

১০. যাকাত আদায় না করা এবং সম্পদ জমা করে রাখা

যারা দুনিয়াতে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর দেওয়া ফরজ বিধান 'যাকাত' ঠিকমতো আদায় করত না এবং সম্পদ কেবল জমিয়ে রাখত, কবরে তাদের জন্য এক লাঞ্ছনাকর শাস্তি অপেক্ষা করছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন কিন্তু সে তার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন (এবং কবরের জীবনে) তার সেই সম্পদকে একটি অতি বিষাক্ত ও চুলহীন বিশাল সাপের রূপ দেওয়া হবে, যার চোখের ওপর দুটি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপটি মৃত ব্যক্তির গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সাপটি তার দুই চোয়ালে কামড়ে ধরে খুবলাতে থাকবে এবং বলবে— "আনা মালুকা, আনা কানজুকা..." অর্থাৎ, "আমিই তোমার সেই সম্পদ, আমিই তোমার সেই জমিয়ে রাখা গুপ্তধন।" (রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪০৩)।

১১. অন্যায়ভাবে মানুষের জমি বা সম্পদ দখল করা

আমাদের সমাজে ক্ষমতার দাপটে বা জাল দলিলের মাধ্যমে অন্যের জমি, ভিটেমাটি বা সম্পদ জোরপূর্বক দখল করার প্রবণতা অনেকের মাঝেই দেখা যায়। বাহ্যিকভাবে দুনিয়াতে পার পেয়ে গেলেও কবরে এর শাস্তি অত্যন্ত ভয়ংকর ও দীর্ঘ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এই অপরাধের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন:
"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমিও দখল করবে, কিয়ামতের দিন (এবং কবরের বারযাখী জীবনে) সাত স্তর জমিন তার গলায় বেড়ি হিসেবে পরিয়ে দেওয়া হবে এবং সে তার নিচে ধসে যেতে থাকবে।"
(রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১০)।

মুফাসসিরগণ বলেন, এই শাস্তির অর্থ হলো মাটির সেই বিশাল বোঝা নিয়ে অপরাধী কিয়ামত পর্যন্ত মাটির নিচে ক্রমশ তলিয়ে যেতে থাকবে, যা এক অবর্ণনীয় শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা।

১২. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা
পিতা-মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করা, তাদের কষ্ট দেওয়া এবং নিজের ভাই-বোন বা আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ভেঙে ফেলা এমন কিছু পাপ, যার শাস্তি আল্লাহ দুনিয়া এবং কবর থেকেই শুরু করে দেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের সমস্ত গুনাহ চাইলে কিয়ামত পর্যন্ত স্থগিত রাখতে পারেন, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি আল্লাহ মৃত্যুর আগেই দুনিয়াতে এবং কবরের প্রথম রাত থেকেই শুরু করে দেন।
সালাফদের মতে, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অভিশাপ নিয়ে কবরে যায়, তার রূহ এক তীব্র সংকীর্ণতা ও অন্ধকারের মুখোমুখি হয়। রহমতের ফেরেশতারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তার কবরটিকে একটি অন্ধকার কুঠুরিতে পরিণত করা হয়। (রেফারেন্স: সুনানে বায়হাকী; মিশকাতুল মাসাবীহ)।

১৩. কোনো প্রাণীকে অনাহারে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা

ইসলাম কেবল মানুষের অধিকার নয়, বরং পশুপাখি ও জীবজন্তুর অধিকার রক্ষার ব্যাপারেও অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। অবলা কোনো প্রাণীকে খাঁচায় বন্দি করে বা বেঁধে রেখে না খাইয়ে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলা কবরের আজাবের একটি অন্যতম কারণ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মিরাজের রাতে এবং বিভিন্ন বর্ণনায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। এক মহিলাকে কবরে ও জাহান্নামে কেবল এই কারণে আজাব দেওয়া হচ্ছিল যে, সে একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখেছিল। সে বিড়ালটিকে নিজেও কোনো খাবার দেয়নি, আবার তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে নিজে জমিনের পোকামাকড় খেয়ে বাঁচতে পারে। শেষ পর্যন্ত বিড়ালটি অনাহারে মারা যায়। রাসূল (সা.) বলেন, তিনি দেখেছেন বিড়ালটি কবরে ওই মহিলাকে অবিরত আঁচড়াচ্ছে এবং কামড়ে ক্ষত-বিশত করছে। (রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪২)।

১৪. মদ্যপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্যে লিপ্ত থাকা

যারা দুনিয়াতে আল্লাহর হারাম করা মদ, মাদক বা যেকোনো ধরণের নেশাজাতীয় দ্রব্যে আসক্ত ছিল এবং তওবা না করেই মারা গেছে, বারযাখী জীবনে তাদের শরীর ও আত্মার ওপর এক তীব্র আজাব নেমে আসে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের কবরে জাহান্নামীদের শরীর থেকে চুইয়ে পড়া বিষাক্ত রক্ত, পুঁজ এবং ঘামের এক ভয়ংকর তরল (যাকে 'ত্বীনাতুল খাবাল' বলা হয়েছে) পান করানো হয়। আগুনে পোড়া এই তপ্ত তরল পান করার সাথে সাথেই তাদের রূহানি শরীরের ভেতরের নাড়ীভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। (রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম)

১৫. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং নির্দোষ মানুষের ওপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো

আমাদের সমাজে ব্যক্তিগত শত্রুতা, জমিজমার বিরোধ কিংবা তুচ্ছ স্বার্থের জন্য আদালতে বা সমাজে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং কোনো পবিত্র ও নির্দোষ মানুষের নামে মিথ্যা অপবাদ (যেমন চরিত্রহনন বা চুরির অপবাদ) ছড়ানোর প্রবণতা দেখা যায়। ইসলামে একে অন্যতম কবিরা গুনাহ বলা হয়েছে, যার আজাব কবরেই শুরু হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মিরাজের রাতের দীর্ঘ বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তিনি এমন একদল মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যাদের জিহ্বা এবং ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে অবিরত কেটে টুকরো টুকরো করা হচ্ছিল। একবার কেটে ফেলার সাথে সাথেই সেই জিহ্বা ও ঠোঁট আবার আগের মতো জোড়া লেগে যাচ্ছিল এবং ফেরেশতারা পুনরায় তা কাটছিল। রাসূল (সা.) জিবরাঈল (আ.)-কে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "এরা হলো আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা বা মানুষ, যারা দুনিয়াতে মিথ্যা কথা বলত, সমাজে মিথ্যা সাক্ষ্য দিত এবং মানুষের নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে বেড়াত।"
(রেফারেন্স: মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২২১১; সহীহ ইবনে হিব্বান)।

মানুষের মুখের ভাষা বা জিহ্বা হলো আল্লাহর দেওয়া এক অপূর্ব নেয়ামত। যে জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর জিকির ও সত্য কথা বলার কথা ছিল, তা দিয়ে যখন কেউ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে কোনো নির্দোষ মানুষের জীবন ধ্বংস করে, তখন প্রকৃতি ও কবর তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। কবরের এই শাস্তিটি মূলত অপরাধের ধরনের সাথে মিল রেখে দেওয়া হয়—যে অঙ্গ দিয়ে অপরাধ করা হয়েছিল, সেই অঙ্গটিকেই কিয়ামত পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয়।

১৬. গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র এবং অশ্লীল সুর শোনা

বর্তমান আধুনিক যুগে প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের সহজলভ্যতার কারণে গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র এবং অশ্লীল সুর শোনা মানুষের নিত্যদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। অনেকেই একে খুব সাধারণ একটি বিনোদন মনে করে অবহেলা করেন, অথচ কুরআন

ও সহীহ হাদীসের আলোকে এটি অত্যন্ত মারাত্মক একটি আত্মিক অপরাধ, যা কবরের কঠিন আজাবের অন্যতম কারণ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা গান-বাজনা এবং অবান্তর কথা বা সুরের ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন:
"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অবান্তর ও লাহওয়াল হাদীস (খেলার ছলে গান-বাদ্য) খরিদ করে... তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর আজাব।"
(সূরা লোকমান, আয়াত: ৬)।

আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আল্লাহর কসম খেয়ে বলেছেন, এখানে 'লাহওয়াল হাদীস' বলতে মূলত গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে। এই অবমাননাকর আজাব কিয়ামতের আগে কবরের বারযাখী জীবনেই শুরু হয়ে যায়।

•হাদিসের আলোকে কবরের ভয়ানক শাস্তি

রাসূলুল্লাহ (সা.) গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রসারের ব্যাপারে উম্মতকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র এবং মদকে হালাল মনে করে লুফে নেবে। আর যারা এই গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবে, তাদের জন্য পরকালে এবং কবরে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

হাদীস ও সালাফদের বর্ণনা অনুযায়ী, যারা দুনিয়াতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেডফোন বা কানের কাছে বাদ্যযন্ত্রের সুর ও গান শুনে আনন্দ পেত এবং আল্লাহর জিকির ও কুরআন তিলাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখত, কবরের অন্ধকার কুঠুরিতে তাদের দুই কানের ভেতর জাহান্নামের তীব্র আগুনে গলানো 'তপ্ত সীসা' ঢেলে দেওয়া হবে। সেই ফুটন্ত সীসার তাপে তার রূহের কান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং সে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকবে। (রেফারেন্স: ইবনে আবী দুনিয়া, কিতাবুল লাহী; তাফসীরে কুরতুবী)।

আসুন, বিষয়টি একটু সহজভাবে আমাদের অন্তরের সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করি। গান-বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্রের সুর মানুষের অন্তরে এক ধরণের কৃত্রিম নেশা তৈরি করে, যা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ, সালাত এবং পরকালের চিন্তা থেকে গাফেল বা উদাসীন করে দেয়। যে কানে আল্লাহর পবিত্র বাণী কুরআনের আলো প্রবেশ করার কথা ছিল, সেই কানকে যখন কেউ হারাম বাদ্যযন্ত্রের সুর দিয়ে অপবিত্র করে, তখন কবর তাকে আর ক্ষমা করে না।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর 'ইগাছাতুল লাহফান' গ্রন্থে লিখেছেন— গান হলো শয়তানের মন্ত্র। যে অন্তরে গানের সুর বাসা বাঁধে, সেই অন্তর থেকে কুরআনের মহাবাণী দূর হয়ে যায়। তাই কবরে এর শাস্তিও হয় অপরাধের ধরণের সাথে মিল রেখে। দুনিয়াতে যে কান দিয়ে বান্দা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে হারাম সুর উপভোগ করেছিল, কবরের প্রথম রাত থেকেই সেই কানে শাস্তির তীব্র জ্বলন শুরু হয়ে যায়।

কবরের আজাব এবং এর নানাবিধ কারণসমূহের এই দীর্ঘ আলোচনা আমাদের মনে কেবল ভয় সৃষ্টি করার জন্য তুলে ধরিনি, বরং আমাদের দুনিয়াবী জীবনকে বেঁচে থাকাকালীনই সুধরে নেওয়ার এখনই বড় সুযোগ। আজ আমরা যারা মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি, খুব দ্রুতই আমাদের এই মাটির নিচে গিয়ে শায়িত হতে হবে।

আমরা কবরের আযাবের এই অধ্যায়ে দেখেছি যে, মানুষের যেসব ভুল বা পাপকে আমরা দুনিয়াতে খুব ছোট বা সাধারণ মনে করি—যেমন অন্যের নামে গীবত করা, মিথ্যা ছড়ানো, অপবাদ দেওয়া,প্রস্রাবের পবিত্রতা না নেওয়া, কিংবা অন্যের হক নষ্ট করা—কবরের জীবনে এই ছোট ছোট অবহেলাই এক একটি বিশাল পাহাড়সম আজাব হয়ে সামনে দাঁড়াবে। তবে এই আলোচনার সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক হলো, আমরা এখনও বেঁচে আছি। আমাদের তওবা করার এবং নিজেদের শুধরে নেওয়ার সময় ফুরিয়ে যায়নি।

কবরের এই ভয়াবহ আজাবসমূহ থেকে বাঁচার চাবিকাঠি আল্লাহ আমাদের হাতেই দিয়ে রেখেছেন। আমরা যদি আজ থেকেই—

আমাদের ফরজ নামাজগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হই,

ওজু ও পবিত্রতার নিয়মগুলো ঠিকঠাক মেনে চলি,
মানুষের গীবত বা পরনিন্দা করা থেকে নিজেদের জিহ্বাকে হেফাজত করি,
এবং প্রতি রাতে ঘুমানোর আগে রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী 'সূরা আল-মুলক' তিলাওয়াত করার অভ্যাস গড়ে তুলি;
তবে যে কবরকে আজ আমরা ভয়ের অন্ধকার কুঠুরি হিসেবে জানলাম, সেই কবরই আল্লাহর রহমতে আমাদের জন্য জান্নাতের এক প্রশান্তিময় বাসর ঘরে পরিণত হবে

পরিশেষে বলা যায়, কবরের আজাব মূলত মানুষের নিজের হাতের কামাই। মানুষ দুনিয়াতে যেমন আমল করবে, কবরের মাটি তার সাথে ঠিক তেমন আচরণই করবে। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো, মাটির নিচের সেই চিরস্থায়ী ঘরের অন্ধকার দূর করার জন্য আজ থেকেই খাঁটি ঈমান ও নেক আমলের আলো প্রস্তুত করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কবরের সমস্ত আজাব থেকে সুরক্ষিত রাখুন এবং আমাদের বারযাখী জীবনকে জান্নাতী আরামে ধন্য করুন। আমীন।

কবরের আজাব থেকে মুক্তির উপায়:

কবরের আজাবের ভয়াবহতা জানার পর একজন মুমিনের প্রধান কাজ হলো এর থেকে পরিত্রাণের উপায়গুলো খুঁজে বের করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করা। নিচে কবরের আযাব থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যা করনীয় তা আলোচনা করা হলো:

১. আত্মশুদ্ধি অর্জন করা

কবরের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যতগুলো আমল বা উপায় রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে প্রাথমিক, গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রধান শর্ত হলো দুনিয়ার জীবনেই নিজের আত্মাকে পবিত্র করা এবং খাঁটি অন্তরে আল্লাহর কাছে তাওবা করা। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি যে, কবরের আজাব মূলত মানুষের দুনিয়াবী জীবনের ছোট-বড় গুনাহের কারণেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ, গুনাহই হলো কবরের আজাবের মূল বীজ। তাই মৃত্যুর আগে যদি সেই বীজ উপড়ে ফেলা যায়, তবে কবরের আজাবের আর কোনো কারণই অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়াময়; মানুষ যতদিন বেঁচে আছে, তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগ পর্যন্ত আল্লাহর রহমতের ও ক্ষমার দরজা সবসময় খোলা থাকে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুমিনদেরকে সাধারণ কোনো তাওবা নয়, বরং 'তাওবায়ে নাসূহা' করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

"অর্থাৎ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো—একেবারে খাঁটি তাওবা।"
(সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৮)।

এখানে 'নাসূহা' শব্দের অর্থ হলো এমন তাওবা যা খাঁটি, যার মধ্যে কোনো লোকদেখানো ভাব নেই এবং যা মানুষকে পুনরায় পাপের দিকে ফিরে যেতে বাধা দেয়। ওলামায়ে কেরাম বলেন, খাঁটি তাওবা হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়—প্রথমত, যে গুনাহটি হয়ে গেছে তা পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, সেই

গুনাহের জন্য মনের ভেতর তীব্র অনুশোচনা ও লজ্জা অনুভব করা এবং আল্লাহর কাছে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা চাওয়া; আর তৃতীয়ত, মনে মনে এই দৃঢ় সংকল্প করা যে, জীবনে আর কখনোই এই পাপে লিপ্ত হব না। বান্দা যখন এই তিন শর্ত মেনে আল্লাহর কাছে ফিরে আসে, তখন তার তাওবা কবুল হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা.) গুনাহগারের হতাশা দূর করতে এবং তাওবার মহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে অত্যন্ত সুন্দর ও আশাবাদী একটি বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَاذَنْبَ لَهُ

অর্থাৎ: "গুনাহ থেকে যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে তাওবা করে, সে যেন এমন এক ব্যক্তিতে পরিণত হয় যার জীবনে কোনো গুনাহই ছিল না।"
(রেফারেন্স: সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫০; বায়হাকী)

এই হাদীসটি আমাদের হৃদয়ে এক পরম শান্তি দেয়। দুনিয়ার আদালতে একজন অপরাধী যতই ক্ষমা চাক না কেন, তার রেকর্ডে অপরাধের দাগ থেকেই যায়। কিন্তু আল্লাহর দরবারের নিয়ম সম্পূর্ণ আলাদা। বান্দা যখন লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে হাত তোলে, তখন আল্লাহ তার অতীতের সব গুনাহ শুধু মাফই করেন না, বরং তার আমলনামার খাতাটি একদম নতুনের মতো পরিষ্কার করে দেন।

আসুন, বিষয়টি একটু সহজভাবে আমাদের জীবনের সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করি। কবরের আজাব তো তখনই
হবে যখন ফেরেশতারা আমাদের আমলনামায় পাপের হিসাব খুঁজে পাবেন। কিন্তু তাওবার মাধ্যমে যদি সেই পাপের খাতাটাই মুছে যায়, তবে আজাব দেওয়ার মতো কোনো উসিলাই আর থাকে না। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) লিখেছেন, যে ব্যক্তি তাওবা করে কবরে প্রবেশ করে, কবর তাকে কোনো শাস্তি দেয় না, বরং একজন নিষ্পাপ শিশুর মতো তাকে জড়িয়ে নেয়।

এই কারণেই সালাফ বা পূর্বসূরি আলেমগণ একটি চমৎকার অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন, আর তা হলো— "প্রতি রাতের আত্মপর্যালোচনা"। তারা প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে বিছানায় বসে সারাদিনের কাজের একটা হিসাব মেলাতেন। আজ কার সাথে খারাপ ব্যবহার হলো, কোন নামাজে অলসতা হলো, চোখের বা মুখের কী গুনাহ হলো—তা মনে করে বালিশে মাথা রাখার আগেই আল্লাহর কাছে কেঁদে ক্ষমা চেয়ে নিতেন। তারা বলতেন, "হে আল্লাহ! আজকের দিনটি তো শেষ, রাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে আমি যেন পবিত্র হয়ে তোমার দরবারে হাজির হতে পারি।" এই ছোট্ট অভ্যাসটি মানুষের প্রতিদিনের গুনাহ প্রতিদিন পরিষ্কার করে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, আত্মশুদ্ধি এবং তাওবা হলো কবরের অন্ধকার দূর করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আমরা মানুষ হিসেবে ভুল বা গুনাহ করে ফেলতে পারি, কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিরাশ হওয়া যাবে না। আমরা এখনও জীবিত আছি, আমাদের নিঃশ্বাস এখনও চলছে—এটাই আল্লাহর দেওয়া সবচেয়ে বড় সুযোগ। আজই, এই মুহূর্তেই যদি আমরা আমাদের ভুলগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ফিরে যাই, তবে কবরের সেই ভয়ানক আজাব থেকে মুক্তি পেয়ে এক পরম প্রশান্তির জীবনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

২. সূরহ আল-মুলক-এর নিয়মিত তিলাওয়াত

কবরের আজাবের ভয়াবহতা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) তাঁর উম্মতকে যে কয়েকটি অত্যন্ত শক্তিশালী, কার্যকরী এবং পরীক্ষিত আমল শিখিয়েছেন—তার মধ্যে অন্যতম প্রধান আমল হলো প্রতি রাতে নিয়ম করে সূরহ আল-মুলক তিলাওয়াত করা। এই আমলটি আকারে ছোট এবং সহজ হলেও বারযাখী বা কবরের জীবনে এর ক্ষমতা ও প্রভাব অপরিসীম। দুনিয়াতে যারা নিয়মিত এই সূরার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে, কবরের ওই বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে এই সূরহ তার কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করার কারন হয়ে দাঁড়াবে।

সূরহ আল-মুলক-এর মহাত্ম্য এবং এর শাফায়াত বা সুপারিশের ক্ষমতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) হাদীস শরীফে অত্যন্ত পরিষ্কার একটি সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

" إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ"

অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই কুরআনে ত্রিশটি আয়াতবিশিষ্ট এমন একটি সূরা রয়েছে, যা কোনো ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর দরবারে অনবরত সুপারিশ করতে থাকবে, যতক্ষণ না তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। আর সেই সূরাটি হলো— 'তাবা-রকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক' (সূরহ আল-মুলক)।"

(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ২৮৯১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪০০)।

এই হাদীসটি থেকে বোঝা যায়, সূরহ আল-মুলক কেবল সাধারণ কোনো সূরা নয়, এটি আল্লাহর দরবারে বান্দার ক্ষমার জন্য এক নাছোড়বান্দা সুপারিশকারী। বান্দার গুনাহ যতই থাকুক না কেন, এই সূরাটি আল্লাহর সাথে এক ধরণের ভালোবাসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হবে এবং বান্দাকে ক্ষমা না করানো পর্যন্ত শান্ত হবে না।

অন্যান্য হাদীসের বর্ণনায় এই সূরাটিকে "আল-মানিআহ" (الْمَانِعَة) বা আজাব প্রতিরোধকারী এবং সুরক্ষাকবচ

বলা হয়েছে।আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কবরের ভেতরের একটি চমৎকার ও বাস্তব দৃশ্য ফুটিয়ে তুলে বলেছেন, যখন কোনো মানুষকে কবরে একাকী রেখে আসা হবে, তখন আজাবের ফেরেশতারা বিভিন্ন দিক থেকে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য ধেয়ে আসবে।

প্রথমে ফেরেশতারা যখন তার পায়ের দিক থেকে আসতে চাইবে, তখন তার পা দুটো দাঁড়িয়ে যাবে এবং বলবে— "তোমরা আমার দিক থেকে এই বান্দাকে আঘাত করতে পারবে না; কারণ সে দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে রাতে এই পা দুটোর ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সূরহ আল-মুলক তিলাওয়াত করত।"

এরপর আজাবের ফেরেশতারা দিক পরিবর্তন করে যখন তার বুক বা পেটের দিক থেকে আসতে চাইবে, তখন তার বুক ও উদর স্বগর্বে বলে উঠবে— "আমার দিক থেকেও তোমাদের আসার কোনো রাস্তা বা অধিকার নেই; কারণ এই বান্দা তার

অন্তরের ভেতর সূরহ আল-মুলককে পরম মমতায় আবৃত করে রেখেছিল এবং মুখস্থ ধারণ করেছিল।"
ঠিক একইভাবে যখন তার মাথার দিক থেকে আজাব আসতে চাইবে, তখন মাথাও একই জবাব দেবে। এভাবে সূরহ আল-মুলক কবরের অন্ধকারে মুমিন বান্দার চারপাশ থেকে একটি দুর্ভেদ্য দেয়াল বা লোহার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, যার ফলে আজাবের ফেরেশতারা শত চেষ্টা করেও বান্দার গায়ে সামান্য আঘাতও করতে পারবে না। (রেফারেন্স: সুনানে নাসায়ী আল-কুবরা; মুস্তাদরাকে হাকীম)।

আসুন, এই আমলটির সহজতা এবং এর ভেতরের গভীর শিক্ষাটি একটু মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করি। বর্তমান ব্যস্ত জীবনে মানুষ কত কঠিন কঠিন কাজ করে, অথচ এই আমলটি কতটা সহজ! প্রতিদিন এশার নামাজের পর কিংবা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে মাত্র ৫ থেকে ৭টি মিনিট সময় বের করে যদি কেউ এই সূরহটি পড়ার অভ্যাস করে, তবে তার কবরের সুদীর্ঘ হাজার হাজার বছরের অন্ধকার জীবন সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আলোকিত হয়ে যাবে।

যে মানুষটি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের নিরাপত্তার জন্য কত ধরণের ইনসিওরেন্স, সিকিউরিটি গার্ড কিংবা আলিশান বাড়ির ব্যবস্থা করে—তার কি উচিত নয় পরকালের চিরস্থায়ী প্রথম স্টেশনটির জন্য এই ৭ মিনিটের একটি চিরন্তন 'কবর ইনসিওরেন্স' বা সুরক্ষাকবচ রেডি রাখা? এই সূরহটি শুধু তিলাওয়াতই নয়, এর অর্থ বুঝে নিজের জীবনের ওপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করলে মানুষের অন্তর অহংকারমুক্ত হয়, যা তাকে সমস্ত গুনাহ থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, সূরহ আল-মুলক হলো কবরের একাকীত্বের সঙ্গী। মাটির নিচের সেই অন্ধকার কুঠুরিতে যখন নিজের বাবা-মা, স্বামী-সন্তান কিংবা কোনো প্রিয় বন্ধুই পাশে থাকবে না, তখন এই ৩০টি আয়াতের সূরাটি আমাদের পাশে এসে আলো ছড়াবে। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত আজ রাত থেকেই অলসতা পরিহার করে প্রতি রাতে সূরা আল-মুলক তিলাওয়াত করার এই চমৎকার অভ্যাসটি গড়ে তোলা, যাতে মৃত্যুর প্রথম রাত থেকেই আমরা আল্লাহর পরম নিরাপত্তায় নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি।

৩. আল্লাহর কাছে নিয়মিত কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

কবরের আজাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত সরাসরি আমল হলো—আল্লাহর কাছে নিয়মিত দুআর মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব এবং সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাঁর পূর্বাপর সমস্ত ভুল-ত্রুটি আল্লাহ আগেই ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিজে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের শেষ বৈঠকে এবং সকাল-সন্ধ্যায় অত্যন্ত আকুলতার সাথে কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন। শুধু নিজেই চাইতেন না, বরং সাহাবায়ে কেরামদের এবং তাঁর পুরো উম্মতকে এই দুআটি নিয়মিত পড়ার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাজের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) এবং দুরুদ শরীফ পড়ার পর, সালাম ফেরানোর ঠিক আগে এই বিশেষ দুআটি পড়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

অর্থ: "হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আজাব থেকে, কবরের আজাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফেতনা (পরীক্ষা) থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফেতনার ক্ষতি থেকে।"

(রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৭৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৮৮)।

হাদীসের কিতাবগুলোতে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবীদের এই দুআটি ঠিক সেভাবেই গুরুত্ব দিয়ে মুখস্থ করাতেন এবং শেখাতেন, যেভাবে পবিত্র কুরআনের কোনো সূরা শিক্ষা দিতেন। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, একজন মুমিনের নামাজ এই দুআটি ছাড়া যেন পূর্ণাঙ্গতা পায় না।

আসুন, এই দুআটির নিয়মিত পাঠ আমাদের জীবনে এবং কবরের মুক্তিতে কীভাবে কাজ করে, তা একটু সহজ ভাষায় গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি। একজন ঈমানদার মানুষ যখন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ এবং অন্যান্য সুন্নাত ও নফল নামাজ আদায় করে, তখন সে প্রতিদিন অন্তত ১৭ থেকে ২০ বারের বেশি আল্লাহর সামনে হাত জোড়

করে বা সেজদাবনত হয়ে এই আকুতি জানায়। সে বারবার বলছে— "হে আল্লাহ, আমাকে কবরের আজাব থেকে বাঁচাও।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত দয়ালু। তাঁর কোনো বান্দা যখন প্রতিদিন এতবার করে একই বিষয়ে তাঁর কাছে খাঁটি অন্তরে আশ্রয় চায়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর সেই বান্দার চোখের পানি এবং আকুল আবেদন কখনোই ফিরিয়ে দেন না। আল্লাহ তাঁর কুদরতি হেফাজতে ওই বান্দার জন্য কবরের আজাব মাফ করে দেন।

তাছাড়া, এই আমলটির একটি চমৎকার মনস্তাত্ত্বিক দিক রয়েছে। মানুষ যখন প্রতি নামাজে নিজের মুখে "কবরের আজাব" শব্দটির উচ্চারণ করে, তখন তার অবচেতন মনে কবরের ভয় এবং পরকালের চিন্তাটা একদম তাজা থাকে। সে যখনই নামাজ শেষ করে দুনিয়ার কোনো গুনাহ বা অন্যায়ের দিকে পা বাড়াতে যায়—যেমন কারো হক নষ্ট করা, মিথ্যা বলা কিংবা গীবত করা—তখনই তার মনে ভেসে ওঠে যে, "আমি তো একটু আগেই নামাজে আল্লাহর কাছে কবরের আজাব থেকে আশ্রয় চেয়েছি! তাহলে আমি কীভাবে আবার এই গুনাহের কাজে লিপ্ত হই?" এই চিন্তাটি আমাদেরকে প্রতিনিয়ত পাপের পথ থেকে দূরে রাখে এবং নেক আমলের দিকে ধাবিত করে।

পরিশেষে বলা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শেখানো এই মাসনূন দুআটি হলো আমাদের জন্য এক বিশাল নিয়ামত। আমরা অনেক সময় নামাজের শেষ বৈঠকে তাড়াহুড়ো করে সালাম ফিরিয়ে ফেলি, যা মোটেও উচিত নয়। সালাম ফেরানোর আগের ওই সময়টুকু দুআ কবুলের একটা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। তাই আমাদের উচিত, আজ থেকেই অলসতা পরিহার করে প্রতিটি ফরজ ও নফল নামাজের শেষ বৈঠকে অত্যন্ত মমতায় এবং অর্থ বুঝে এই দুআটি পড়ার অভ্যাস করা। আমরা যদি দুনিয়াতে আমাদের মুখে আল্লাহর কাছে এই আশ্রয়টুকু নিয়মিত চেয়ে যেতে পারি, তবে ইনশাআল্লাহ কবরের প্রথম রাতে আল্লাহ আমাদের একা ফেলে রাখবেন না, বরং তাঁর রহমতের চাদর দিয়ে আমাদের ঢেকে রাখবেন।

৪. বিশেষ কিছু রোগে বা বিশেষ সময়ে মৃত্যু হলে কবরের আযাব মাফ হয়ে যায়

কবরের আজাব থেকে মুক্তির উপায়গুলোর মধ্যে এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রহমত ও অনুগ্রহের সাথে সম্পর্কিত। দুনিয়াতে মানুষ তার নেক আমলের মাধ্যমে যেমন মুক্তি পেতে পারে, তেমনি আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ ভালোবাসার কারণে কিছু সুনির্দিষ্ট রোগ এবং বিশেষ কিছু মর্যাদাপূর্ণ সময়ে মৃত্যুর কারণে বান্দাকে কবরের আজাব ও ফেতনা থেকে সরাসরি মুক্তি দিয়ে দেন। এটি মুমিন বান্দার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ এক নিয়ামত।

ক. পেটের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু

আমাদের সমাজে অনেকেই কঠিন রোগে ভুগে মারা যান। বাহ্যিকভাবে একে কষ্টদায়ক মনে হলেও মুমিনের জন্য এর শেষ পরিণতি অত্যন্ত চমৎকার। হাদীস শরীফে এসেছে:

"مَنْ يَقْتُلْهُ بَطْنُهُ لَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِه"ِ

অর্থাৎ: "যাকে পেটের রোগ (যেমন ডায়রিয়া, লিভারের সমস্যা, আলসার, ক্যানসার বা পেটের ভেতরের যেকোনো কঠিন ব্যাধি) মেরে ফেলেছে, তাকে তার কবরে কখনোই আজাব দেওয়া হবে না।"

(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ১০৬৪; সুনানে নাসায়ী)।

সালাফ বা পূর্বসূরি আলেমগণ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পেটের রোগের তীব্র যাতনা ও কষ্ট মানুষ যখন দুনিয়াতে সহ্য করে, তখন আল্লাহ তার এই শারীরিক কষ্টের বিনিময়ে তার আমলনামার সমস্ত ছোট-বড় গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এই দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা দুনিয়াতেই মানুষের পাপের কাফফারা বা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। ফলে মৃত্যুর পর যখন সে কবরে প্রবেশ করে, তখন সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় থাকে এবং কবর তাকে কোনো শাস্তি না দিয়ে পরম শান্তিতে জড়িয়ে নেয়।

খ. জুমুআর দিনে বা জুমুআর রাতে মৃত্যু

ইসলামে সপ্তাহের সব দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিনকে সবচেয়ে সেরা এবং মর্যাদাপূর্ণ দিন বলা হয়েছে। এই বরকতময় দিনে বা রাতে কোনো মুমিনের মৃত্যু হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সৌভাগ্যের লক্ষণ। হাদীসে এসেছে:

"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ"ِ

অর্থাৎ: "কোনো মুসলমান যদি জুমুআর দিনে (শুক্রবার) কিংবা জুমুআর রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কবরের ফেতনা (প্রশ্নোত্তর ও আজাব) থেকে সুরক্ষিত রাখেন।"
(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ১০৭৪; মুসনাদে আহমাদ)।

জুমুআর দিনটি হলো রহমত ও মাগফিরাতের দিন। এই দিনে আল্লাহর বিশেষ রহমতের হাওয়া বইতে থাকে। আল্লাহ তাঁর কুদরতে এই সময়ে মৃত্যুবরণকারী মুমিন বান্দার কবরের অন্ধকার দূর করে দেন এবং তাকে ফেরেশতাদের কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ও আজাবের ভয়াল থাবা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখেন।

৫. গীবত পরিহার, প্রস্রাবের ছিটা থেকে পবিত্রতা ও সদকায়ে জারিয়া কবরের আযাব মাফের কারন

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেখেছি যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কিছু সুনির্দিষ্ট অবহেলা বা পাপের কারণে—যেমন ওজুর পবিত্রতা ঠিকমতো না নেওয়া, অন্যের নামে গীবত ও চোগলখুরী করা—বেশিরভাগ মানুষের কবরের আজাব হয়ে থাকে। সুতরাং, যুক্তির নিয়মেই এই অপরাধগুলোর বিপরীত আমলগুলো যদি আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, তবে তা আমাদের কবরের আজাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেবে।

ক. ওজুর পবিত্রতা রক্ষা ও জিহ্বার হেফাজত
আমাদের জীবনের অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি আমল হলো পবিত্রতা এবং মুখের ভাষা নিয়ন্ত্রণ করা।

শারীরিক পবিত্রতা: প্রস্রাব বা পায়খানা করার পর অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করা। অলসতা বা তাড়াহুড়ো করে প্রস্রাবের ছিটা যেন নিজের শরীর, পোশাক বা কাপড়ে না লাগে, সেদিকে শতভাগ খেয়াল রাখা। কারণ পবিত্র শরীর ও ওজুর আলো কবরের অন্ধকার দূর করার অন্যতম মাধ্যম।

জিহ্বার হেফাজত: নিজের মুখ ও জিহ্বাকে অন্যের নামে গীবত (পেছনে সমালোচনা), চোগলখুরী (একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে ঝগড়া লাগানো) এবং মিথ্যা বলা থেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখা। যে জিহ্বা দুনিয়াতে মানুষের সম্মান রক্ষা করেছে এবং আল্লাহর জিকিরে মগ্ন ছিল, কবর সেই জিহ্বার মালিককে পরম যত্নে আগলে রাখে।

খ. সদকায়ে জারিয়া

সদকা বা দান-সদকা মানুষের পরকালীন জীবনের এক মহা নেয়ামত। বিশেষ করে 'সদকায়ে জারিয়া' (এমন দান যার সওয়াব মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকে) কবরের আজাব নিভিয়ে দেওয়ার জন্য এক মোক্ষম অস্ত্র। যেমন— একটি মসজিদ নির্মাণে শরিক হওয়া, কোনো মাদ্রাসায় কুরআন শরীফ দান করা, কিংবা মানুষের পানের জন্য একটি কূপ বা পানির ব্যবস্থা করে দেওয়া।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُور"...ِ

অর্থাৎ: "নিশ্চয়ই দান-সদকা কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ও গরমকে সম্পূর্ণ শান্ত বা ঠান্ডা করে দেয়, ঠিক যেভাবে পানি দাউদাউ করে জ্বলা আগুনকে নিভিয়ে ছাই করে দেয়।"

(রেফারেন্স: তাবারানী; তাফসীরে ইবনে কাসীর; মিশকাতুল মাসাবীহ)।

মানুষ যখন মাটির নিচে একা হয়ে যাবে, তখন দুনিয়াতে তার করে যাওয়া সদকার সওয়াবগুলো আলোর নদী হয়ে তার কবরে প্রবেশ করবে। দুনিয়াতে যে মানুষটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের কষ্টের টাকা গরিব-দুঃখীকে দান করেছে, কবরের সেই

ভয়ানক উত্তাপ ও আগুনের মধ্যে তার এই দানটি এক বিশাল শীতল ছায়া হয়ে তার মাথার ওপর দাঁড়িয়ে যাবে।

কবরের আজাব থেকে মুক্তির এই উপায়গুলো আমাদের চোখের সামনে একদম স্পষ্ট। কিছু বিষয় আল্লাহর সরাসরি রহমত (যেমন বিশেষ সময়ে বা রোগে মৃত্যু) আর কিছু বিষয় আমাদের নিজেদের হাতের আমল (যেমন পবিত্রতা, জিহ্বার হেফাজত ও সদকা)। আমরা যদি আজ থেকেই নিজেদের জীবনকে এই সুন্নাহ অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে পারি, তবে কবরের সেই ভয়ানক আজাব থেকে বেঁচে আমরা এক পরম শান্তিময় বারযাখী জীবন লাভ করতে পারব।

কবরের আজাব থেকে মুক্তির উপায়গুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমাদের জন্য অত্যন্ত স্পষ্ট করে রেখে গেছেন। এটি এমন কোনো কঠিন বিষয় নয় যা মানুষ অর্জন করতে পারবে না। শুধু প্রয়োজন একটু সচেতনতা এবং নিয়মিত আমলের অভ্যাস। আমরা যদি আজ থেকেই গীবত ছেড়ে দিই, ওজুর পবিত্রতা ঠিক রাখি, প্রতি রাতে সূরা মুলক পড়ার নিয়ম করি এবং নামাজের শেষ বৈঠকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই—তবে ইনশাআল্লাহ কবরের সেই অন্ধকার ঘরটি আমাদের জন্য আলোর প্রাসাদে পরিণত হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবরের আজাব থেকে মুক্তি দিন। আমীন।

মৃত্যুর স্মরণে আত্মশুদ্ধি :

ইসলামী জীবনদর্শনে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণের চেয়ে তার ভেতরের জগত বা অন্তরের পবিত্রতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ভেতরের জগতকে পরিষ্কার করার নামই হলো 'আত্মশুদ্ধি' বা আরবির পরিভাষায় 'তাযকিয়াতুন নাফস'। সহজ কথায়, আত্মশুদ্ধি হলো নিজের মন ও অন্তরকে যাবতীয় অন্যায়, পাপাচার, লোকদেখানো ভাব, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ এবং দুনিয়ার অন্ধ মোহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র করে আল্লাহর খাঁটি আনুগত্যে সঁপে দেওয়া।

ইসলামে এই আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ, একটি পাত্র যদি ভেতর থেকে নোংরা থাকে, তবে তাতে যেমন দামি কোনো খাবার রাখা যায় না, ঠিক তেমনি মানুষের অন্তর যদি পাপে কলুষিত থাকে, তবে তার কোনো ইবাদতই আল্লাহর দরবারে প্রকৃত মূল্যায়ন পায় না। আর এই কঠিন ও জটিল আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য ইসলাম আমাদের সবচেয়ে সহজ, কার্যকরী এবং অলৌকিক যে হাতিয়ারটি দিয়েছে—সেটা হলো "মৃত্যুর স্মরণ"।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের একাধিক জায়গায় মানুষকে এই চিরন্তন সত্যটির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার এই জীবনটা স্থায়ী নয়। সূরহ আল-ইমরানে আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেন:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অনুবাদ: "প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে।"
(সূরা আল-ইমরান, আয়াত: ১৮৫)।

এই একটি মাত্র বাক্য মানব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং অকাট্য সত্য। দুনিয়াতে মানুষ কত কিছু নিয়ে মতভেদ করে, কিন্তু মৃত্যু এমন এক সত্য যা বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা নির্বিশেষে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ একবাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য। আল্লাহ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, আমরা মাটির ওপর যতই দাপট দেখিয়ে বেড়াই না কেন, একদিন আমাদের এই নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়ে যাবেই।

আসুন, বিষয়টি আমাদের বাস্তব জীবনের অনুভূতির সাথে মিলিয়ে একটু সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করি। মানুষ যখন খুব গভীরভাবে চিন্তা করে যে সে এই দুনিয়াতে চিরকাল থাকবে না, যেকোনো মুহূর্তে—হয়তো আজ রাতে কিংবা আগামীকাল সকালে—চোখের পলকে তার হায়াত শেষ হয়ে যেতে পারে, তখন তার ভেতরের অবাধ্য মনটা এক মুহূর্তেই শান্ত হয়ে যায়। মানুষের মন যখন বুঝতে পারে যে সে আসলে এক নিঃশ্বাসের পথিক, তখন তার ভেতরের অহংকার, ক্ষমতার দাপট আর দুনিয়ার সব লোভ-লালসা নিমেষেই ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

মৃত্যু হলো মূলত একটি আয়নার মতো, যা মানুষের সব কৃত্রিম মুখোস খুলে তার আসল রূপটি চোখের সামনে ধরিয়ে দেয়। দুনিয়াতে যে মানুষটি নিজেকে অনেক শক্তিশালী মনে করে, কোটি টাকার মালিক মনে করে কিংবা অন্যের ওপর জুলুম করতে দ্বিধা করে না—মৃত্যুর একটিমাত্র চিন্তা তাকে এক সেকেন্ডের মধ্যে আল্লাহর সামনে একদম সাধারণ, অসহায় এবং বিনয়ী এক বান্দা হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেয়। সে তখন বুঝতে পারে, যে কাফনের কাপড়ে তাকে জড়িয়ে কবরে নামানো হবে, সেই কাপড়ে কোনো পকেট থাকে না; দুনিয়ার কোনো সম্পদই তার সাথে যাবে না।

এই কারণেই আত্মশুদ্ধি বা মনকে পবিত্র করার প্রথম পাঠই শুরু হয় মৃত্যুর এই অবধারিত সত্যকে মনে-প্রাণে স্বীকার করার মাধ্যমে। মৃত্যুর চিন্তা মানুষের অন্তরের জমে থাকা পাপের জং বা ময়লাগুলোকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়।

মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে জীবনবিমুখ বা কর্মহীন করে না, বরং তা মানুষের ভেতর এক ধরণের আধ্যাত্মিক বিপ্লব ঘটিয়ে দেয়। যে অন্তরে প্রতিদিন অন্তত একবার মৃত্যুর চিন্তা উঁকি দেয়, সেই অন্তর কখনো কারো ক্ষতি করতে পারে না, কারো প্রতি হিংসা রাখতে পারে না। তাই থিসিসের এই পরিচ্ছেদের মূল কথা হলো—আমরা যদি আমাদের জীবনকে সুন্দর করতে চাই, আত্মাকে পবিত্র করতে চাই, তবে প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের এই অবধারিত মৃত্যুকে স্মরণে রাখতেই হবে। মৃত্যুর স্মরণের হাত ধরেই আমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হবে, যা আমাদের খাঁটি আত্মশুদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) উম্মতের অন্তরকে নরম রাখার জন্য এবং দুনিয়ার অন্ধ মোহ থেকে বাঁচানোর জন্য বারবার মৃত্যুকে স্মরণ করার তাগিদ দিয়েছেন। মানুষের মন যখন দুনিয়ার চাকচিক্য আর আনন্দের পেছনে ছুটে আখেরাতকে ভুলে যায়, তখন সেই মনকে সঠিক রাস্তায় ফিরিয়ে আনার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের মৃত্যুর কথা মনে করার কথা বলেছেন।

হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে উদ্দেশ্য করে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চোখ খুলে দেওয়ার মতো বাণী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ

অর্থ: "তোমরা বেশি বেশি স্মরণ করো সুখ-আনন্দের ছেদকারীকে — আর তা হলো মৃত্যু।"
(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ২৩০৭; সুনানে ইবনে মাজাহ)।

এই হাদীসে রাসুল (সা.) মৃত্যুকে 'স্বাদ বিনষ্টকারী' বলেছেন। এর কারণ হলো, মানুষ যখন দুনিয়ার কোনো মোহে বা আনন্দে মত্ত থাকে, তখন মৃত্যুর একটিমাত্র চিন্তা তার সেই সমস্ত সাময়িক আনন্দের মোহকে এক নিমেষে দূর করে দেয়।

অন্য এক হাদীসে সাহাবীগণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে একটি চমৎকার প্রশ্ন করেছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান, চতুর ও চটপটে মানুষ কে?"
আমাদের সমাজ হলে হয়তো উত্তর আসত—যে অনেক টাকা কামাতে পারে বা যার অনেক বুদ্ধি। কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসুলুল্লাহ (সা.) উত্তর দিলেন:
"মুমিনদের মধ্যে তারাই হলো সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, যারা মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী আসল জীবনের জন্য দুনিয়া থেকেই সবচেয়ে উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মূলত তারাই হলো প্রকৃত চতুর ও বুদ্ধিমান মানুষ।"
(রেফারেন্স: সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪২৫৯)।

এই হাদীস দুটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মিলিয়ে একদম সহজ ভাষায় একটু বিশ্লেষণ করি। বর্তমান যুগে আমরা মনের শান্তি খোঁজার জন্য কত রকমের

মোটিভেশনাল বই পড়ি, কত মানুষের লেকচার শুনি। অথচ আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার সবচেয়ে বড় মোটিভেশন দিয়ে গেছেন, আর তা হলো—মৃত্যু।

মানুষ যখন খুব আনন্দের মুহূর্তে থাকে, বড় কোনো ব্যবসার লাভ-ক্ষতির হিসাব করে কিংবা ক্ষমতার দাপটে অন্ধ হয়ে যায়, তখন সে যদি বুক ভরে একটা শ্বাস নিয়ে শুধু একবার চিন্তা করে—"আমি তো চিরদিন থাকব না, আজ রাতেও আমার মৃত্যু হতে পারে"—তখনই তার অন্তরের ভেতরের সমস্ত অন্যায় ইচ্ছা আর হারাম লোভ শান্ত হয়ে যায়।
গাড়ির যেমন ব্রেক থাকে যা দুর্ঘটনা থেকে বাঁচায়, ঠিক তেমনি মৃত্যুর এই স্মরণ হলো মানুষের জীবনের ব্রেক। এটি মানুষকে পাপাচারের পথ থেকে টেনে ধরে এবং ভালো কাজের দিকে মনকে তাগিদ দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এই হাদীসগুলো আমাদের জীবনকে থমকে দেওয়ার জন্য নয়, বরং সুন্দর করার জন্য এসেছে। যে মানুষটি প্রতিদিন অন্তত একবার নিজের মৃত্যুর কথা ভাবে, তার পক্ষে কখনো কোনো মানুষের ক্ষতি করা বা অহংকার করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের উচিত, আল্লাহর রাসূলের এই সুন্নাতটি মেনে প্রতিদিন কিছুটা সময় হলেও মৃত্যুর কথা মনে করা, যাতে আমাদের মন পবিত্র থাকে এবং আমরা দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় জগতেই সফল হতে পারি।

মৃত্যুর স্মরণই মানুষের নৈতিক চরিত্র পরিবর্তন করে।

বিষয়টি আমাদের চারপাশের বাস্তব ও সামাজিক জীবনের সাথে মিলিয়ে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবেন। আমরা মুখে অনেকেই অনেক ধর্মের কথা বলি, কিন্তু মন থেকে যখন একজন মানুষ মৃত্যুকে সত্যি বলে বিশ্বাস করে এবং তা সবসময় মনে রাখে, তখন তার ভেতরের পুরো চরিত্রটাই বদলে যায়।

১. দুনিয়ার অন্ধ মোহ ও লোভ থেকে মুক্তি

আমাদের সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, মানুষ টাকার পেছনে অন্ধের মতো ছুটছে। ঘুষ, দুর্নীতি আর অন্যায়ের মূল কারণ হলো মানুষের ভেতরের অতিরিক্ত লোভ। কিন্তু মৃত্যুর চিন্তা মানুষের এই লোভের দেওয়ালে মস্ত বড় একটা ধাক্কা দেয়। মানুষ যখন মনে-প্রাণে বুঝতে পারে যে—মৃত্যুর পর তাকে যে কাফনের কাপড়ে জড়িয়ে কবরে রেখে আসা হবে, সেই কাপড়ে কোনো পকেট থাকে না; আর মাটির নিচে ওই সাড়ে তিন হাত গর্তে দুনিয়ার আলিশান বাড়ি, দামি গাড়ি বা ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা কোনো কাজেই আসবে না—তখন সে অন্যায়ভাবে টাকা উপার্জন করা বা দুর্নীতি করার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে। সে তখন অল্পে তুষ্ট হতে শেখে, যাকে আরবির পরিভাষায় 'কানাআত' বলা হয়। সে যা পায়, তা নিয়েই আলহামদুলিল্লাহ বলে শান্তিতে থাকতে পারে।

২. হিংসা, পরশ্রীকাতরতা ও অহংকার দূরীকরণ

আমাদের চারপাশের বেশিরভাগ ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা এবং পাপের মূল কারণ হলো মানুষের ভেতরের অহংকার এবং অন্যের ভালো দেখে হিংসা করা। মানুষ ভাবে সে-ই বুঝি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ক্ষমতাশালী। কিন্তু মৃত্যুর অবধারিত চিন্তা মানুষকে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়— "আজ যাকে দেখে আমি হিংসা করছি বা যার ওপর অহংকার দেখাচ্ছি, কাল হয়তো সে অথবা আমি—যেকোনো একজন মাটির নিচে চলে যাব। এই মাটিই আমাদের আসল ঠিকানা।" এই সহজ চিন্তাটি মানুষের বুক থেকে অহংকারের পাহাড় নামিয়ে দেয় এবং অন্তরকে হিংসার বিষ থেকে এক নিমেষে মুক্ত করে দেয়। মানুষের মন তখন সবার জন্য নরম ও উদার হয়ে যায়।

৩. তওবা ও ইবাদতে একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি

যে মানুষটি মনে করে সে দুনিয়াতে আরও অনেক দিন বাঁচবে, তার ভেতরে একটা মারাত্মক অলসতা কাজ করে। সে নামাজের সময় হলে ভাবে— "পরে পড়ে নেব", গুনাহ করার পর ভাবে— "বুড়ো বয়সে গিয়ে তওবা করে নেব।" কিন্তু যে মানুষটি

ভালো করে জানে যে তার আগামীকালের সূর্য দেখার বা পরের শ্বাসটি নেওয়ার কোনো গ্যারান্টি নেই, সে আজকেই, এই মুহূর্তেই আল্লাহর কাছে খাঁটি মনে তওবা করে নেয়। সে যখন নামাজের মোসাল্লায় দাঁড়ায়, তখন সে তার প্রতিটি নামাজ এমন মনোযোগ দিয়ে আদায় করে, যেন এটিই তার জীবনের শেষ নামাজ। এই চিন্তা ইবাদতের স্বাদ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৪. মানুষের হক বা অধিকার আদায়ের মানসিকতা

মৃত্যুর ভয় যার মনের ভেতর একদম তাজা থাকে, সে কখনো কোনো মানুষের ওপর জুলুম করতে বা কারো অধিকার নষ্ট করতে পারে না। সে সবসময় মনে মনে ভয় পায় যে— "আমি যদি আজ কারো মনে কষ্ট দিই, কারো টাকা মেরে দিই আর ওই অবস্থাতেই যদি আজ রাতে আমার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে কবরের প্রথম রাত থেকেই তো আমাকে আল্লাহর কঠিন কাঠগড়ায় আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে!" এই ভয়টার কারণে সে পাওনাদারের পাওনা দ্রুত চুকিয়ে দেয়, বাবা-মা, স্বামী-সন্তান এবং প্রতিবেশীর হক আদায় করে। সে সবার সাথে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র এবং দয়াশীল আচরণ করতে শুরু করে।

অর্থ্যাৎ মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে কখনো সমাজবিমুখ বা অলস করে তোলে না, বরং এটি মানুষকে একজন খাঁটি ও আদর্শ মানুষ হিসেবে সমাজে বাঁচতে শেখায়। এভাবেই মৃত্যুর স্মরণ একজন মানুষকে সব রকম পাপ অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত রাখে। যে মানুষটির মনে মৃত্যুর চিন্তা তাজা থাকে, তার হাত দিয়ে কখনো কোনো অন্যায় কাজ হতে পারে না। সে নিজের আত্মাকে পবিত্র রাখে এবং সমাজের জন্য একটি আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে। তাই আমাদের নিজেদের নৈতিক চরিত্র সুন্দর করার জন্য প্রতিদিন অন্তত কিছুটা সময় হলেও এই অবধারিত মৃত্যুর কথা মনে করা উচিত।

আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরি বা সালাফে সালেহীনগণ মৃত্যুর স্মরণকে কেবল মুখের কথায় বা তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁরা শুধু মুখে বড় বড় কথা বলতেন না, বরং তাঁদের পুরো জীবনটাই ছিল এই মৃত্যুর স্মরণের এক চমৎকার ও বাস্তব প্রতিফলন।

তাঁরা কীভাবে মৃত্যুকে স্মরণে রেখে নিজেদের আত্মাকে পবিত্র করেছিলেন, তা বুঝতে আমাদের ইতিহাসের দুটি বিখ্যাত ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনা জানা দরকার:

ইতিহাসের অন্যতম শক্তিশালী এবং মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা ছিলেন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। যাঁর ভয়ে পারস্য আর রোম সাম্রাজ্য কাঁপত, সেই মহান ও প্রতাপশালী ওমরের কবরভীতি এবং পরকালভীতি কেমন ছিল, তা সত্যিই আমাদের অবাক করে। তিনি তাঁর হাতের আংটিতে একটি অসাধারণ এবং চোখ খুলে দেওয়ার মতো বাক্য খোদাই করে রেখেছিলেন, যা তিনি প্রতিদিন রাজকার্য পরিচালনা করার সময় দেখতেন। বাক্যটি ছিল:

"كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا يَا عُمَر"ُ

(কাফা বিল মাওতি ওয়া ইযান ইয়া ওমর)

অর্থ: "হে ওমর! তোমাকে নসিহত, ভালো উপদেশ বা সতর্ক করার জন্য এই অবধারিত মৃত্যুই যথেষ্ট।"

অর্ধপৃথিবীর শাসক হওয়া সত্ত্বেও এই একটিমাত্র বাক্যের কথা চিন্তা করে তিনি সারারাত আল্লাহর ভয়ে কাঁদতেন। নিজের আরামের ঘুম হারাম করে তিনি রাতের আঁধারে মদীনার অলিতে-গলিতে প্রজাদের দুঃখ-কষ্ট দেখতে বের হতেন। তিনি সবসময় মনে করতেন, "আমি যদি আজ কোনো প্রজাকে তার হক থেকে বঞ্চিত করি, তবে এই আংটির লেখা অনুযায়ী আমার মৃত্যুর পর আমি আল্লাহর কাছে কী জবাব দেব?" মৃত্যুর এই তীব্র স্মরণই তাঁকে ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং এক পবিত্র আত্মার মানুষে পরিণত করেছিল।

এরপর সালাফদের যুগের আরেকজন প্রখ্যাত ও বড় মাপের বুজুর্গ ছিলেন ইমাম ফুদাইল ইবনে ইয়াজ (রহ.)। একবার তিনি এক প্রবীণ বা বৃদ্ধ লোককে দেখতে পেয়ে তার কাছে গেলেন এবং খুব সহজ একটা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা চাচা, আপনার বয়স এখন কত হলো?"

লোকটি উত্তর দিল, "আমার বয়স এখন ষাট বছর।" তখন ইমাম ফুদাইল (রহ.) লোকটির দিকে তাকিয়ে গভীর এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন— "তার মানে আপনি গত ৬০ বছর ধরে অনবরত হেঁটে হেঁটে আপনার আসল মালিক রবের দিকেই ভ্রমণ

করছেন! আর আপনি প্রায় আপনার গন্তব্যের একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন (অর্থাৎ আপনার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে)!"
ইমাম ফুদাইলের এই কথাটি বৃদ্ধ লোকটির মনের ভেতর তীরের মতো গিয়ে বিঁধল। সে তীব্র ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বলে উঠল, "ইন্নালিল্লাহ! আপনি এ কী কথা শোনালেন! তাহলে এখন আমার উপায় কী? আমি তো আমার জীবনের ৬০টি বছর অলসতায় আর গুনাহে কাটিয়ে দিলাম!"

তখন ইমাম ফুদাইল (রহ.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে অত্যন্ত চমৎকার ও সহজ একটি সমাধান দিলেন। তিনি বললেন:
"উপায় খুবই সহজ, চাচা! আপনার জীবনের বাকি যে কয়টি দিন বা শ্বাস অবশিষ্ট আছে, সেগুলোকে আল্লাহর ইবাদত আর নেক আমল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলুন। আজই খাঁটি মনে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। তাহলে দয়াময় আল্লাহ আপনার এই শেষ জীবনের ভালো কাজের উসিলায় পেছনের ফেলে আসা ৬০ বছরের সমস্ত গুনাহ ও ভুল-ত্রুটি এক নিমেষে মাফ করে দেবেন।"

থিসিসটির এই দয়স্পর্শী পরিচ্ছেদ থেকে আমাদের সামনে এটি দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে—মৃত্যুর স্মরণ কোনো হতাশা, দুনিয়া ছেড়ে বনে-জঙ্গলে চলে যাওয়া বা জীবনবিমুখতার নাম নয়। বরং মৃত্যু হলো আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সুন্দর, নিয়মতান্ত্রিক ও অর্থবহ করার এক অনন্য অনুঘটক বা চাবিকাঠি। মৃত্যুর চিন্তা মানুষকে কখনো কর্মহীন বা অলস করে না, বরং মানুষের ভেতরের অলসতা ভেঙে নেক আমল করার গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। যে মানুষের অন্তরে প্রতিদিন অন্তত একবার নিজের মৃত্যুর কথা তাজা থাকে, সেই অন্তর কখনো পচে যেতে পারে না, কালো হতে পারে না; তা সবসময় আল্লাহর জিকির, দয়া এবং ভালোবাসার আলোয় সজীব থাকে।

তাই আমাদের এই অধ্যায়ের সারকথা হলো—যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই আমাদের নিজেদের আত্মাকে শুদ্ধ করতে চাই, আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করতে চাই, সমাজে একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে বাঁচতে চাই এবং কবরের সেই ভয়ানক আজাব থেকে চিরতরে মুক্তি পেতে চাই, তবে আমাদের প্রতিদিনের চেনা যাপনে, প্রতিটা পদক্ষেপে

মৃত্যুকে স্মরণ করতেই হবে। মৃত্যু আমাদের দরজায় কড়া নাড়ার আগেই যেন আমরা আমাদের মাটির নিচের ঘরটি আলোর আমল দিয়ে সাজিয়ে নিতে পারি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করে খাঁটি আত্মশুদ্ধি অর্জন করার এবং সালাফদের মতো সুন্দর জীবন গড়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

পার্থিব জীবনে আখিরাতের প্রস্তুতির রূপরেখা:

ইসলামী জীবনদর্শনে 'দুনিয়া' এবং 'আখিরাত'—এই দুটি জগতকে একে অপরের থেকে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ বা নিয়ম নেই। আমাদের পুণ্যবান পূর্বসূরিগণ বা সালাফে সালেহীনগণ একটি চমৎকার কথা বলতেন । তাঁরা বলতেন, "দুনিয়া হলো মূলত আখিরাতের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ।" অর্থাৎ, একজন কৃষক তার জমিতে যেমন বীজ রোপণ করবে, রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে যেভাবে যত্ন নেবে—সে ফসল কাটার মৌসুমে ঠিক তেমনই ফল লাভ করবে। এখন কেউ যদি তার নিজের জমিতে ইচ্ছা করে বিষাক্ত কাঁটার গাছ রোপণ করে, আর মনে মনে মিষ্টি আমের আশা করে—তবে সে যেমন এক মস্ত বড় বোকা; ঠিক তেমনি কোনো মানুষ যদি দুনিয়ার বুকে রাত-দিন পাপাচার, অন্যায় আর অলসতায় নিজের জীবন কাটিয়ে দেয় এবং পরকালে গিয়ে জান্নাতের বড় আশা করে, তবে তার চেয়ে বড় বোকা ও গাফেল এই পৃথিবীতে আর কেউ হতে পারে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের এই পার্থিব বা দুনিয়ার জীবনকে দিয়েছেন কেবলই একটা সাময়িক পরীক্ষার হল হিসেবে। এখানে আমরা চিরকাল থাকতে আসিনি। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-মুলকে আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষার কথাটি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

অনুবাদ: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের ভালো করে পরীক্ষা করে নিতে পারেন যে—তোমাদের মধ্যে আমল ও চরিত্রের দিক থেকে কে সবচেয়ে বেশি উত্তম।"

(সূরা আল-মুলক, আয়াত: ২)।

এই আয়াতটি আমাদের প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় যে, আমাদের এই সুন্দর শরীর, চোখের সামনের ধন-সম্পদ, দুনিয়াবী ক্ষমতা কিংবা বড় বড় ডিগ্রি—সবকিছুই একদম সাময়িক। এগুলো আমাদের চিরকাল ধরে রাখার জন্য বা অহংকার করার জন্য দেওয়া হয়নি; বরং এগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা মাটির নিচের জীবনের জন্য কতটুকু আসল পুঁজি বা রসদ জমা করতে পারছি, সেটাই হলো পরীক্ষার মূল বিষয়।

পার্থিব জীবনে আখেরাত গোছানোর বা প্রস্তুতির মূল ভিত্তিটাই শুরু হয় মনের ভেতরের একটি গভীর চেতনা থেকে। সেই চেতনাটি হলো— "আমি এই দুনিয়াতে চিরদিন থাকার জন্য আসিনি। আমি এখানে একটা ছোট্ট সফরের মুসাফির মাত্র।"

যখন একজন মানুষ প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে নিজের মনকে এই কথাটি মনে করিয়ে দেয়, তখন তার পুরো জীবনযাত্রাই বদলে যায়। সে দুনিয়াকে অন্ধের মতো ভালোবাসে না, আবার দুনিয়া ছেড়ে চলেও যায় না; বরং দুনিয়ার প্রতিটা মুহূর্তকে সে আখেরাতের অন্ধকার কবর গোছানোর একটা চমৎকার মাধ্যম বা পরম সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। সে বুঝতে পারে, দুনিয়ার ঘর যেমন অস্থায়ী, তেমনি এর সুখ-দুঃখও অস্থায়ী। তাই সে দুনিয়ার মোহে পড়ে আখেরাত নষ্ট করার মতো ভুল আর কখনো করে না।

দুনিয়া ও আখেরাতের সম্পর্কটি হলো সুতো এবং ঘুড়ির মতো। দুনিয়াতে আমাদের আমল যত মজবুত হবে, আখেরাতে আমাদের মুক্তির ঘুড়ি তত ওপরে উড়বে। থিসিসের এই পরিচ্ছেদটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আখেরাতের আসল প্রস্তুতি শুরু হয় মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। আমরা যদি আজ থেকেই আমাদের মনকে বোঝাতে পারি যে আমাদের আসল বাড়ি হলো মাটির নিচের সেই সাড়ে তিন হাত কবর—তবে আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী হবে এবং আমাদের পার্থিব জীবন আখেরাতের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে।

আমরা আমাদের এই পার্থিব বা দৈনন্দিন জীবনে কীভাবে একদম সহজ উপায়ে আখেরাতের চমৎকার প্রস্তুতি নিতে পারি—তার একটি গাইডলাইন বা রূপরেখা কয়েকটি সহজ পয়েন্টের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হলো।

আখেরাত গোছানো কোনো কঠিন বিষয় নয়, যদি আমরা আমাদের প্রতিদিনের অভ্যাসে এই ৪টি বিষয় যুক্ত করে নিতে পারি:

১. খাঁটি তাওবা ও প্রতিদিনের আত্মপর্যালোচনা

আখেরাতের প্রস্তুতির সর্বপ্রথম এবং প্রধান কাজ হলো—নিজের জানা-অজানা সব গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে খাঁটি অন্তরে লজ্জিত হয়ে তওবা করা। মানুষ হিসেবে চলতে ফিরতে আমাদের প্রতিদিন কত রকম ছোট-বড় ভুল হয়ে যায়। আমাদের সালাফ বা পূর্বসূরিদের একটা নিয়ম ছিল; তাঁরা প্রতিদিন রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে বিছানায় শুয়ে পুরো দিনের ভালো-মন্দ কাজের একটা হিসাব মেলাতেন। একে আরবির পরিভাষায় বলা হয় 'মুহাসাবাহ' বা নিজের আত্মপর্যালোচনা করা। একজন দোকানদার বা ব্যবসায়ী যেমন দিনশেষে খাতা খুলে তার লাভ-ক্ষতির নিখুঁত হিসাব করে, একজন আখেরাতের যাত্রী মুমিন বান্দাও ঠিক তেমনি নিজের মনকে জিজ্ঞেস করবে— "আজ সারাদিনে আমি আল্লাহর কয়টি হুকুম মানলাম, আর কয়টি গুনাহের কাজ করলাম?" যদি গুনাহ বেশি হয়ে যায়, তবে সাথে সাথে বিছানায় বসেই চোখের পানি ফেলে ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করে ঘুমানো—এটিই হলো একজন খাঁটি মুমিনের আসল স্বভাব।

২. ফরজ ইবাদতগুলো নিখুঁতভাবে আদায় করা

আখিরাতের আদালতে মৃত্যুর পর সর্বপ্রথম যে বিষয়টি নিয়ে বান্দাকে কঠিন জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে, তা হলো তার ফরজ ইবাদতসমূহ—বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বা নামাজ। আমরা দুনিয়াতে যতই নফল ইবাদত করি, পীর-মাশায়েখের দরবারে যাই বা দান-সদকা করি না কেন, আমাদের প্রধান ফরজ নামাজই যদি ঠিক না থাকে, তবে পরকালের বা কবরের কোনো ধাপই আমাদের জন্য সহজ হবে না। তাই আখেরাতকে সুন্দর করে গোছানোর জন্য সব ধরণের অলসতা আর বাহানা পরিহার করতে হবে। অত্যন্ত মনোযোগের সাথে, ধীরস্থিরভাবে, অর্থ বুঝে এবং ঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মজবুত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

৩. মানুষের হক (হুকুকুল ইবাদ) সম্পর্কে শতভাগ সচেতন থাকা

ইসলামে আল্লাহর হকের চেয়ে মানুষের হকের বিষয়টি অনেক বেশি জটিল এবং ভয়ানক। আল্লাহ তায়ালা অত্যন্ত দয়ালু, তিনি চাইলে তাঁর নিজের ইবাদতের কোনো ঘাটতি বা অবহেলা নিজের গুণে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে কোনো মানুষের মনে আঘাত দিই, কারো পেছনে গীবত বা পরনিন্দা করি, কারো অধিকার নষ্ট করি কিংবা কারো টাকা মেরে দিই—তবে সেই ব্যক্তি নিজে থেকে মন থেকে মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কখনোই তা মাফ করবেন না। তাই আখেরাতের আসল প্রস্তুতির একটা মস্ত বড় অংশ হলো—নিজের পরিবার, স্বামী, সন্তান, পিতা-মাতা, প্রতিবেশী এবং আশেপাশের সমস্ত মানুষের সাথে সুন্দর ও নম্র আচরণ করা এবং কারো হক যেন বিন্দুমাত্র নষ্ট না হয়, সেদিকে শতভাগ খেয়াল রাখা।

৪. সদকায়ে জারিয়া বা স্থায়ী আমলের ব্যবস্থা করা

আমরা যখন এই দুনিয়া ছেড়ে মারা যাব, তখন আমাদের নিজেদের হাত-পায়ের সমস্ত আমল চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী (সা.) আমাদের এমন কিছু চমৎকার বুদ্ধি শিখিয়ে গেছেন, যার মাধ্যমে মৃত্যুর পরও কবরের মাটির নিচে নিশ্চিন্তে বসে বসে সওয়াব পাওয়া সম্ভব। একেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় 'সদকায়ে জারিয়া' বা চলমান দান। যেমন— একটা মসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণে কিছু টাকা দান করা, মাদ্রাসার গরিব এতিম বাচ্চাদের পড়ার জন্য পবিত্র কুরআন শরীফ কিনে দেওয়া, মানুষের পানির কষ্ট দূর করতে একটি কূপ বা টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া, কিংবা কাউকে কোনো দ্বীনি জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে এই কাজগুলো করে যেতে পারলে, মৃত্যুর পরও কবরের সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুয়ে শুয়েও আমলনামায় সওয়াবের নদী বইতে থাকবে।

আখেরাতের এই ব্যবহারিক রূপরেখাটি আমাদের প্রতিদিনের দৈনন্দিন জীবনের মাঝেই লুকিয়ে আছে। আমরা সংসার করব, চাকরি-ব্যবসা করব, কিন্তু আমাদের নিয়ত থাকবে পরিষ্কার। এই ৪টি আমল যদি আমরা আমাদের জীবনে নিয়মিত ধরে রাখতে

পারি, তবে ইন শা আল্লাহ মৃত্যুর প্রথম রাত থেকেই আমাদের কবর এক শান্তিময় জান্নাতের বাগানে পরিণত হবে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আখেরাতের এই নিয়মিত প্রস্তুতি মনের ওপর একটা কেমন যেনো শান্তিময় প্রভাব ফেলে।বর্তমান আধুনিক যুগের মানুষের দিকে তাকালে দেখা যায়, একটুখানি টাকা-পয়সার সমস্যা হলে, ব্যবসায় বা চাকরিতে কোনো ক্ষতি হলে কিংবা দুনিয়ার কোনো প্রিয় মানুষকে হারালে মানুষ একদম হতাশায় ভেঙে পড়ে। অনেকে তো মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার মতো মারাত্মক পথও বেছে নেয়। কিন্তু যে মানুষটি প্রতিদিন নিয়ম করে নিজের আখেরাত আর কবরের প্রস্তুতি নেয়, তার মানসিক অবস্থা থাকে সাধারণ মানুষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে খুব ভালো করেই জানে যে দুনিয়ার এই দুঃখ-কষ্ট বা আনন্দ—সবকিছুই একদম সাময়িক। এখানে সাময়িক কোনো বড় ক্ষতি হয়ে গেলেও সে কখনো ভেঙে পড়ে না, বরং সে মনে মনে ভাবে— "দুনিয়ার যা ক্ষতি হওয়ার হয়েছে হোক, আমার আসল আখেরাত তো ঠিক আছে! আমার কবরের আলো তো রেডি আছে!" এই ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আমাদের সমস্ত ধরণের মানসিক চাপ ও হতাশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও শান্ত রাখে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হাদীস শরীফে আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া এই শান্ত মনের মানুষদের প্রশংসা করে একটি চমৎকার বাণী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

"যে ব্যক্তির মূল চিন্তা, ফিকির বা লক্ষ্য হবে কেবলই আখেরাত গোছানো, আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরের ভেতর এক ধরণের ধনী ভাব বা অল্পে তুষ্টির মানসিকতা তৈরি করে দেন, যার কারণে তার মন সবসময় শান্ত থাকে। আর দুনিয়া নিজে থেকেই বাধ্য হয়ে তার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে। আর পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তির মূল লক্ষ্য বা লোভ হবে কেবলই এই দুনিয়া, আল্লাহ তার দুই চোখের সামনে সবসময় এক ধরণের দারিদ্র্য বা অভাবের ভয় ঝুলিয়ে রাখেন (সে কোটি টাকার মালিক হলেও তার মন ভরে না)। আর দুনিয়া তার কপালে যতটুকু লেখা আছে, তার চেয়ে এক বিন্দুও বেশি সে কোনোদিন পায় না।"

(রেফারেন্স: সুনানে তিরমিজি, হাদীস নং ২৪৬৫)।

পার্থিব বা দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের প্রস্তুতির এই রূপরেখাটি কিন্তু কোনো কঠিন বা অসম্ভব বিষয় নয়। এর জন্য নিজের পরিবার-সংসার বা দুনিয়ার কাজকর্ম সবকিছু ছেড়ে দিয়ে দিনরাত কেবল জায়নামাজে বসে থাকার কোনো প্রয়োজন ইসলামে নেই। বরং আমরা আমাদের চাকরি, ব্যবসা, পড়াশোনা, রান্নাবান্না বা সংসার—সবকিছুই যার যার জায়গায় ঠিকঠাকমতো করব, কিন্তু আমাদের মনের ভেতরের নিয়তটা থাকবে পরিষ্কার, অর্থাৎ সবকিছু করব আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

একজন ব্যবসায়ী যখন ওজনে কম না দিয়ে সততার সাথে কাস্টমারের কাছে জিনিস বিক্রি করে, একজন চাকরিজীবী যখন টেবিলের তলা দিয়ে ঘুষ না খেয়ে সততার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করে, কিংবা একজন শিক্ষার্থী যখন ভালো মানুষ হওয়ার নিয়তে পড়াশোনা করে—তখন তাদের দুনিয়ার এই সাধারণ কাজগুলোও আখেরাতের চমৎকার প্রস্তুতিতে পরিণত হয়। ইসলাম আমাদের এটাই শিখিয়েছে যে নিয়ত ঠিক থাকলে দুনিয়ার কাজও ইবাদত হয়ে যায়।

তাই আসুন, দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী মোহ, লোভ-লালসা আর মরিচিকার পেছন থেকে নিজেদের চোখ ফিরিয়ে নিয়ে, আমাদের আসল ও চিরস্থায়ী ঠিকানা—মাটির নিচের সেই সাড়ে তিন হাত ঘরের সুদীর্ঘ জীবনের জন্য আজ থেকেই একটু একটু করে নেক আমলের আলোর পুঁজি জমা করি। দুনিয়ার জীবন তো যেকোনো দিন ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু আখেরাতের পুঁজি আমাদের কবরের প্রথম রাত থেকেই শান্তিতে আগলে রাখবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পার্থিব জীবনে আখেরাতের উত্তম প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করুন, আমীন।

সদকায়ে জারিয়া ও কবরে এর প্রভাব:

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় 'সদকা' মানে হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো দান-সদকা বা ভালো কাজ করা। আর 'জারিয়া' শব্দের আভিধানিক বা শাব্দিক অর্থ হলো যা অনবরত প্রবাহিত হয়, চলমান থাকে বা কখনো ফুরিয়ে যায় না।
সুতরাং, 'সদকায়ে জারিয়া' বলতে এমন কিছু দান বা কল্যাণমূলক কাজকে বোঝায়, যার ভালো ফল বা উপকারিতা সমাজে মানুষের মাঝে দীর্ঘদিন ধরে চলমান থাকে।

আমাদের সমাজে যে সাধারণ দান-সদকা করা হয়, তার নিয়ম হলো—আপনি আজকে একজন গরিব বা ক্ষুধার্ত মানুষকে কিছু টাকা দিলেন বা এক বেলা খাবার খাওয়ালেন, সে তা সাথে সাথে খেয়ে নিল বা খরচ করে ফেলল এবং আপনার আমলনামায় তৎক্ষণাৎ সওয়াব পাওয়া হয়ে গেল। কিন্তু সদকায়ে জারিয়া হলো এমন এক অলৌকিক এবং বিশেষ ধরণের দান, যা মানুষ দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে মাত্র একবার করে রেখে যায়, অথচ সে মারা যাওয়ার পরও তার সেই নেক কাজের সওয়াব বিন্দুমাত্র কমে না; বরং অনবরত তার আমলনামায় জমা হতে থাকে।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হাদীস শরীফে সদকায়ে জারিয়ার এই চমৎকার ও অনন্য বৈশিষ্ট্যটি আমাদের সামনে খুব সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন:
"মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন দুনিয়াতে তার নিজের হাত-পায়ের সমস্ত আমল করার বা নতুন করে সওয়াব পাওয়ার রাস্তা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমল বা মাধ্যমের সওয়াব কোনোদিন বন্ধ হয় না; মানুষের মৃত্যুর পরও কবরে তা অনবরত জারি থাকে—
১. সদকায়ে জারিয়া (চলমান দান বা কল্যাণমূলক কাজ)।
২. এমন দ্বীনি জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত উপকার লাভ করে।
৩. এমন নেক বা সৎ সন্তান, যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে।"
(রেফারেন্স: সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬lll; সুনানে তিরমিজি)।

এই হাদীসটি আমাদের জীবনের এক মস্ত বড় চোখ খুলে দেয়। মানুষ যখন মারা যায়, তখন সে নিজে আর একটা বার 'সুবহানাল্লহ' বা 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে। কিন্তু সে যদি দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে এমন কোনো কাজ করে যায় যা মানুষের উপকারে আসছে, তবে সে মাটির নিচে কবরের অন্ধকার ঘরে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকবে, আর আখেরাতের ব্যাংকে তার সওয়াবের খাতা অনবরত চলতেই থাকবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক পরম উপহার বা সুযোগ, যার মাধ্যমে ছোট এক জীবনের সামান্য পুঁজিখন্ড দিয়েও অনন্ত আখেরাতের জন্য সওয়াবের পাহাড় বানানো সম্ভব।

কবরের অন্ধকার জীবনে সদকায়ে জারিয়ার প্রভাব:

এই সদকায়ে জারিয়া কীভাবে কবরের জীবনে মৃত মানুষের ওপর প্রভাব ফেলে?
আমরা যখন আমাদের কোনো অত্যন্ত প্রিয়জন, বন্ধুবান্ধব বা বাবা-মাকে কবরে শুইয়ে দিয়ে আসি, তখন সেই সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে কোনো আলো থাকে না, ফ্যান থাকে না, কোনো আপনজন পাশে বসে মিষ্টি গল্প করার মতো থাকে না। চারিদিকে থাকে শুধু ঘুটঘুটে অন্ধকার, পোকা-মাকড়ের ভয় আর মাটির কঠিন চাপ। এই চরম নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের সময়ে সদকায়ে জারিয়া কবরবাসীর জন্য বন্ধু,আলোর প্রদীপ হয়ে দেখা দেয়।

আমরা দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে যে ধরণের সদকায়ে জারিয়া করতে পারি এবং কবরে তার যে জাদুকরী প্রভাব পড়ে, তা নিচে ৩টি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে গভীরভাবে ফুটিয়ে তোলা হলো:

১. পানির কষ্ট দূর করা

আমাদের সমাজে অনেক প্রত্যন্ত বা গরিব এলাকায় সাধারণ মানুষেরা বিশুদ্ধ পানির জন্য খুব কষ্টে থাকে। আপনি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো গরিব এলাকায় একটি পানির কল, টিউবওয়েল, কুয়া বা ওয়াটার ফিল্টার বসিয়ে দেন—তবে যতদিন ধরে সেই কল থেকে একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ, একটা ছোট পাখি বা একটা সাধারণ পশুও

পানি খেয়ে নিজের কলিজা জুড়াবে, ঠিক ততদিন পর্যন্ত কবরের ভেতরে শুয়ে থাকা আপনার আমলনামায় সওয়াব পৌঁছাতে থাকবে। সালাফদের মতে, দুনিয়াতে মানুষের তৃষ্ণা মেটানোর এই সওয়াব কবরের ভেতরের উত্তাপ বা আজাবকে শান্ত ও শীতল করে দেয়।

২. মসজিদ-মাদ্রাসায় শরিক হওয়া

একটি মসজিদ বা মাদ্রাসা নির্মাণে কিছু টাকা দান করা কিংবা মাদ্রাসার এতিম বাচ্চাদের পড়ার জন্য কয়েকটি পবিত্র কুরআন শরীফ কিনে দেওয়া একটি চমৎকার সদকায়ে জারিয়া। আপনি হয়তো একদিন মারা যাবেন, কিন্তু আপনার কিনে দেওয়া কুরআন শরীফটি হাত দিয়ে ধরে যখন একটি এতিম শিশু প্রতিদিন দুল দুল করে তিলওয়াত করবে, আপনার দান করা মসজিদের মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে যখন শত শত মানুষ প্রতি ওয়াক্তে সেজদা করবে—তখন প্রতিটা অক্ষরের জন্য, প্রতিটা সেজদার জন্য আপনার অন্ধকার কবরে নূরের আলো বা সওয়াবের বারিধারা পৌঁছাতে থাকবে। ফেরেশতারা সেই সওয়াব নিয়ে এসে বলবেন, "হে কবরবাসী! এটি দুনিয়া থেকে তোমার সেই দানের সওয়াব এসেছে।"

৩. দ্বীনি জ্ঞান ছড়ানো ও সৎ সন্তানের দুআ

কাউকে একটি ভালো কথা শেখানো, কোনো দ্বীনি বই উপহার দেওয়া কিংবা নিজের সন্তানকে ছোটবেলা থেকে সৎ ও দ্বীনদার হিসেবে গড়ে তোলাও সদকায়ে জারিয়ার অংশ। সন্তান যখন বড় হয়ে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে হাত তুলে কাঁদবে— "রব্বির হামহুমা কামা রব্বাইয়ানি সগিরা", তখন কবরে থাকা পিতা-মাতার মর্যাদা আল্লাহর দরবারে এক লাফে অনেক উচ্চে বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

অর্থ্যাৎ, সদকায়ে জারিয়া হলো আখেরাতের ব্যাংকে জমা করা এমন এক ফিক্সড ডিপোজিট, যা কোনোদিন লস হয় না। দুনিয়ার ব্যাংক আপনাকে সামান্য লাভ দেবে, কিন্তু আল্লাহর এই ব্যাংক আপনাকে মৃত্যুর পরও প্রতিদিন কোটি কোটি সওয়াব দিয়ে আপনার কবরকে জান্নাতের চমৎকার এক বাগানে পরিণত করে রাখবে। তাই আমাদের

প্রত্যেকের উচিত, দুনিয়ার পেছনে অতিরিক্ত খরচ না করে, নিজের উপার্জনের একটা ছোট অংশ হলেও সদকায়ে জারিয়ার পেছনে ব্যয় করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে আমাদের বেঁচে থাকতেই কবরের জীবনের আসল আলো প্রস্তুত করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

অসিয়ত ও হক আদায়:

ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় 'অসিয়ত' মানে হলো কোনো মানুষ তার মৃত্যুর কোনো কিছু কার্যকর করার জন্য যে বৈধ উপদেশ, দ্বীনি দিকনির্দেশনা বা সম্পত্তি বণ্টনের লিখিত বা মৌখিক ঘোষণা দিয়ে যায়।

আমাদের সমাজের একটা সাধারণ ভুল ধারণা হলো, আমরা অনেকেই মনে করি অসিয়ত করা বুঝি শুধু অনেক বুড়ো বা বয়োবৃদ্ধ মানুষের কাজ; যার জীবনের শেষ সময় চলে এসেছে সে-ই শুধু অসিয়ত করবে। কিন্তু ইসলাম আমাদের পরিষ্কার শিখিয়েছে যে, মৃত্যু যেহেতু কোনো বয়স মানে না এবং যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো মানুষের জীবনে চলে আসতে পারে, তাই একজন সচেতন মুমিনের সবসময় নিজের একটি অসিয়তনামা প্রস্তুত রাখা উচিত। বিশেষ করে যে মানুষের ওপর কোনো ব্যক্তির ঋণ বা পাওনা রয়েছে, তার জন্য অসিয়ত লিখে রাখা অত্যন্ত জরুরি বা ওয়াজিব।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হাদীস শরীফে অসিয়ত করার গুরুত্ব ও তাগিদ বোঝাতে গিয়ে একটি চমৎকার ও চোখ খুলে দেওয়ার মতো বাণী দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

অর্থ: "কোনো মুসলিম ব্যক্তির যদি এমন কিছু সম্পত্তি বা বিষয় থাকে যা অসিয়ত করা দরকার, তবে অসিয়তনামাটি নিজের কাছে সুন্দর করে লিখিতভাবে জমা না রেখে টানা দুটি রাত কাটানোও তার জন্য উচিত নয়।"
(রেফারেন্স: সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৩৮; সহীহ মুসলিম)।

মানুষ যখন হঠাৎ করে কোনো দুর্ঘটনা বা রোগে মারা যায়, তখন তার পরিবারের মানুষেরা অনেক সময় জানতেও পারে না যে—মৃত ব্যক্তিটি দুনিয়াতে কার কার কাছ থেকে কত টাকা ধার নিয়েছিলেন, কার সাথে তার ব্যবসার হিসাব বাকি ছিল, কিংবা কারো কোনো আমানত বা দামি জিনিস তার কাছে গচ্ছিত ছিল কি না।
আবার অনেক সময় মৃত ব্যক্তি হয়তো মনে মনে খুব করে চেয়েছিলেন তার উপার্জিত সম্পত্তির একটা ছোট অংশ কোনো এতিমখানায়, গরিবের কল্যাণে বা মসজিদে দান করতে; কিন্তু সে মুখে বা ডায়েরিতে লিখে অসিয়ত না করার কারণে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ বা সন্তানেরা সব সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ফলে ওই মৃত মানুষটি দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নেওয়ার পর সওয়াব কামানোর একটা মস্ত বড় সুযোগ হারিয়ে ফেলে। এই কারণেই ইসলাম অসিয়তকে এত বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে মানুষের মৃত্যুর পর তার পরিবার কোনো বিপদে বা ঝগড়া-বিবাদে না জড়ায় এবং মৃত ব্যক্তির আত্মাও কবরে শান্তিতে থাকতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, ইসলামে নিজের মোট সম্পত্তির সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) পরিমাণ অংশই কেবল অসিয়ত বা দান করার নিয়ম রয়েছে, এর বেশি নয়।

এবার আসুন আমরা আলোচনা করি 'হক আদায়' বা মানুষের অধিকার দুনিয়াতেই চুকিয়ে দেওয়ার গুরুত্ব নিয়ে ইসলামে হক বা অধিকারকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—এক হলো 'হুকুকুল্লাহ' বা আল্লাহর হক (যেমন: নামাজ, রোজা, হজ, জিকির ইত্যাদি) এবং অন্যটি হলো 'হুকুকুল ইবাদ' বা বান্দার হক (যেমন: মানুষের পাওনা টাকা পরিশোধ করা, ভালো ব্যবহার করা, কারো অধিকার রক্ষা করা ইত্যাদি)।

কবরের অন্ধকার জীবনে মানুষের এই 'বান্দার হক' বা পাওনা টাকা চুকানোর বিষয়টি যে কত বড় ভয়ানক প্রভাব ফেলে, তা ভাবলে আমাদের গা শিউরে ওঠে। আমাদের দয়াময় আল্লাহ তায়ালা এতটাই দয়ালু যে, হাশরের ময়দানে তিনি চাইলে নিজের ইবাদতের কোনো ঘাটতি, অলসতা বা অবহেলা সম্পূর্ণ নিজের গুণে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে কোনো মানুষের এক আনা পয়সাও অন্যায়ভাবে মেরে দিয়ে থাকেন, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেন কিংবা কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকেন—তবে সেই মানুষটি কিয়ামতের মাঠে নিজে থেকে মাফ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা কখনোই আপনাকে মাফ করবেন না।

কবরের জীবনে হকের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে হাদীস শরীফে দুটি অত্যন্ত ভয় জাগানিয়া কথা বলা হয়েছে:

প্রথমত, আল্লাহর রাসূল (সা.) বলেছেন— "আল্লাহর রাস্তায় যে ব্যক্তি নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছে, সেই মহান শহীদের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেন; কিন্তু তার মাথার ওপর যদি কোনো মানুষের 'ঋণ' বা পাওনা থাকে, তবে তা শহীদেরও মাফ করা হয় না।" (সহীহ মুসলিম)।

দ্বিতীয়ত, অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন— "মুমিন ব্যক্তির রূহ বা আত্মাটি মৃত্যুর পর তার ঋণের কারণে আসমানে ঝুলন্ত ও বন্দি অবস্থায় আটকে থাকে, যতক্ষণ না দুনিয়া থেকে তার সেই ঋণ বা পাওনা টাকা পরিশোধ করা হয়।"
এই কথাগুলো আমাদের চোখ খুলে দেয় যে, একজন মানুষ যতই বড় পরহেজগার বা আবেদ হোক না কেন, সে যদি মানুষের হক বা পাওনা টাকা দুনিয়াতে ফাঁকি দিয়ে মারা যায়, তবে কবরের প্রথম রাত থেকেই তাকে কঠিন আজাব আর জাঁতাকলের মুখোমুখি হতে হবে।

অসিয়ত লিখে রাখা এবং মানুষের হক আদায় করা হলো আখেরাতের আদালতের ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট বা মুক্তির প্রধান চাবিকাঠি। আমরা যতই নফল দান-সদকা বা জিকির করি না কেন, আমাদের খাতা যদি মানুষের ঋণে বা হকের দায়ে ভারী থাকে, তবে আমরা কবরে শান্তিতে ঘুমাতে পারব না।

তাই থিসিসের এই পরিচ্ছেদের মূল শিক্ষা হলো—আমাদের উচিত আজই, এই মুহূর্তেই যদি কারো কোনো পাওনা টাকা বা ধার আমাদের কাছে বাকি থাকে, তা দ্রুত হাতজোড় করে পরিশোধ করে দেওয়া। আর যদি তাৎক্ষণিক দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে, তবে একটি ডায়েরিতে বা কাগজে সুন্দর করে লিখে নিজের পরিবারের কাছে অসিয়ত করে যাওয়া— "আমি অমুক মানুষের কাছে এত টাকা ঋণী আছি, আমার মৃত্যুর পর আমার সম্পত্তি থেকে যেন সবার আগে এই ঋণ পরিশোধ করা হয়।" এই সামান্য সচেতনতা ও আমল আমাদের কবরের সুদীর্ঘ জীবনকে আজাবের হাত থেকে বাঁচিয়ে এক শান্তিময় জান্নাতের বাগানে পরিণত করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে মানুষের

হক সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এবং সঠিক উপায়ে অসিয়ত করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

আধুনিক বস্তুবাদ বনাম কবরের বাস্তবতা:

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের চারপাশের সমাজব্যবস্থা যে দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তাকে এক কথায় বলা হয় 'আধুনিক বস্তুবাদ' বা 'মেটেরিয়ালিজম'।

এই বস্তুবাদের মূল কথাই হলো—"যা চোখে দেখা যায়, যা ছোঁয়া যায় এবং যা ভোগ করা যায়, শুধু সেটাই সত্য।" বস্তুবাদী দুনিয়া মানুষকে শেখায় কেবল নিজের ক্যারিয়ার গোছাতে, বড় আলিশান বাড়ি বানাতে, ব্যাংকের ব্যালেন্স বাড়াতে আর আধুনিক সব প্রযুক্তি ও বিলাসিতার মধ্যে ডুবে থাকতে।
এই দর্শনে বিশ্বাসী মানুষ মনে করে, দুনিয়ার এই জীবনটাই সবকিছু, এর বাইরে অন্য কোনো জগত বা সত্যের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই আধুনিক ও চাকচিক্যময় বস্তুবাদের দেওয়ালের ঠিক ওপাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক চূড়ান্ত চিরকালীন সত্য—যা হলো "কবরের বাস্তবতা"।

আধুনিক বস্তুবাদ মানুষকে এক ধরণের মোহের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখে। মানুষ আজ নতুন মডেলের গাড়ি, দামি স্মার্টফোন কিংবা সুরম্য অট্টালিকা নিয়ে কত রকমের অহংকার করে। একজন মানুষ তার পুরো জীবনটাই বিলিয়ে দেয় কীভাবে সমাজে নিজের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি টিকিয়ে রাখা যায়। অথচ কবরের বাস্তবতা মানুষের এই সমস্ত বস্তুবাদী অহংকারকে এক সেকেন্ডের মধ্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। বিজ্ঞান যতই উন্নত হোক, প্রযুক্তির যতই দাপট থাকুক না কেন—মৃত্যুর পর যখন একজন মানুষকে তার সমস্ত আধুনিক কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে মাটির নিচে একদম একা রেখে আসা হয়, তখন তার সেই আলিশান জীবনযাত্রার কোনো চিহ্নই আর অবশিষ্ট থাকে না। দামী ডিজাইনার পোশাকের জায়গায় তখন স্থান পায় কয়েক গজ সাদা সুতির কাফনের কাপড়, আর নরম এসি রুমের বদলে জোটে মাটির বিছানা। কবরের এই

নিঃশব্দ নীরবতা প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার যে বস্তুকে আমরা চিরস্থায়ী ভেবেছিলাম, তা আসলে এক মস্ত বড় মরিচিকা বা ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একজন মানুষ যখন পুরোপুরি বস্তুবাদী চিন্তায় মগ্ন থাকে, তখন তার কাছে পরকাল বা কবরের জীবনকে খুব দূরের বা কাল্পনিক কোনো বিষয় মনে হয়। সে প্রতিনিয়ত অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, অন্যের হক নষ্ট করে এবং ভাবে যে তার এই ক্ষমতা চিরকাল থাকবে। কিন্তু সে যখন কোনো জানাজায় অংশ নেয় কিংবা কোনো আপনজনকে নিজের হাতে কবরের মাটির গভীরে নামিয়ে দিয়ে আসে, তখন তার ভেতরের সেই বস্তুবাদী অহংকার এক মস্ত বড় ধাক্কা খায়। তার মন তখন চিৎকার করে বলতে বাধ্য হয়— "আমি যে জগত নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম, তা তো আসলে আমার সাথে যাবে না! আমার আসল জগত তো এই মাটির নিচেই!"
কবরের এই বাস্তবতা মানুষকে শেখায় যে মানুষের আসল মূল্য তার ধন-সম্পদে নয়, বরং তার সুন্দর চরিত্রে এবং নেক আমলে। বস্তুবাদ মানুষকে স্বার্থপর ও লোভী বানায়, আর কবরের চিন্তা মানুষকে বিনয়ী, দয়াশীল এবং অল্পে তুষ্ট হতে শেখায়।

পরিশেষে বলা যায়, আধুনিক বস্তুবাদ বনাম কবরের বাস্তবতা হলো মূলত অন্ধকারের সাথে আলোর লড়াই। বস্তুবাদ মানুষের চোখকে দুনিয়ার আলো দিয়ে অন্ধ করে রাখে, আর কবরের চিন্তা মানুষের ভেতরের আত্মাকে পরকালের আসল আলোয় জাগিয়ে তোলে। থিসিসের এই পরিচ্ছেদের মূল শিক্ষা হলো—আমরা আধুনিক দুনিয়াতে চলব, ব্যবসা-বাণিজ্য বা পড়াশোনা সবই করব, কিন্তু আমাদের মনকে বস্তুবাদের গোলাম হতে দেব না। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার সমস্ত বস্তুগত সফলতার শেষ সীমানা হলো সাড়ে তিন হাত মাটির কবর। তাই এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুবাদের মোহ ছেড়ে আমাদের আসল চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত।

উপসংহার ও সমাজ গঠনে পরকালভীতির ভূমিকা:

একটি সুন্দর, শান্তিময়, নিরাপদ এবং অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন করার জন্য পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে কত রকমের আইন-কানুন বানিয়েছে, কত বড় বড় আদালত আর আধুনিক জেলখানা তৈরি করেছে। কিন্তু শুধু পুলিশ, লাঠি বা বাহ্যিক আইন দিয়ে যে সমাজ থেকে অপরাধ পুরোপুরি দূর করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তা আমরা আমাদের প্রতিদিনের সকালের খবরের কাগজ খুললেই খুব সহজে দেখতে পাই। আইনের চোখে ধুলো দিয়ে বা সর্ষের ভেতর ভূত থাকার কারণে মানুষ প্রতিনিয়ত ঘুষ খাচ্ছে, অন্যের অধিকার নষ্ট করছে এবং দুর্বলদের ওপর জুলুম করছে। কিন্তু সমাজ পরিবর্তনের এমন একটি জাদুকরী চাবিকাঠি রয়েছে, যা মানুষের অন্তরের ভেতর থেকে তাকে একজন খাঁটি ও সোনার মানুষে পরিণত করে—আর তা হলো 'পরকালভীতি' বা কবরের সেই কঠিন জবাবদিহিতার ভয়।

আমরা যখন শহরের কোনো বড় শপিং মলে বা ব্যাংকে যাই এবং সেখানে একটি নোটিশ টাঙানো দেখি— "সতর্কবার্তা: আপনি সিসি ক্যামেরার আওতায় আছেন", তখন কিন্তু আমরা আমাদের আচরণে খুব সাবধানে চলি। ক্যামেরা আমাদের দেখছে এই ভয়ে আমরা কোনো অন্যায়, চুরি বা খারাপ কাজ করার সাহস পাই না।

ইসলামের দৃষ্টিতে পরকালভীতি হলো মানুষের মনের ভেতরের এক অদৃশ্য সিসি ক্যামেরা। যে মানুষটির মনের মণিকোঠায় এই গভীর বিশ্বাস গেঁথে যায় যে— "আমি যদি এই বদ্ধ অন্ধকার ঘরে একা একা বসেও কোনো মানুষের ক্ষতি করার প্ল্যান করি, কারো হক বা টাকা আত্মসাৎ করি কিংবা মোবাইলের স্ক্রিনে গোপনে কোনো হারাম বা নোংরা জিনিস দেখি, দুনিয়ার কোনো মানুষ বা পুলিশ না দেখলেও আমার মালিক আল্লাহ কিন্তু সবকিছু দেখছেন! আর মৃত্যুর ঠিক প্রথম রাত থেকেই আমাকে এই প্রতিটা গোপন কাজের জন্য কবরের কঠিন মাটিতে একা একা জবাবদিহি করতে হবে"—তখন তার নিজের জাগ্রত বিবেকই তার জীবনের সবচেয়ে বড় পাহারাদার হয়ে দাঁড়ায়। তাকে ভালো পথে রাখার জন্য বা অপরাধ থেকে দূরে রাখার জন্য তখন বাইরে থেকে কোনো পুলিশ বা আদালতের চাবুকের কোনো প্রয়োজন হয় না। সে নিজে থেকেই ভালো মানুষ হয়ে যায়।

আমাদের বর্তমান সমাজের সবচেয়ে বড় বড় সামাজিক ব্যাধি এবং পাপ হলো—ঘুষের লেনদেন, দুর্নীতি, ওজনে কম দেওয়া, ইভটিজিং, ধর্ষণ,নারীদের ওপর নানা রকম জুলুম এবং এতিমের সম্পদ লুটে নেওয়া।

এই সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপন অপরাধের মূল কারণ হলো মানুষ আখেরাতকে ভুলে গিয়ে দুনিয়াকে চিরস্থায়ী ভাবছে। কিন্তু পরকালভীতি যার মনের ভেতর প্রতিটা শ্বাসে তাজা থাকে, সে কখনো লোভের বশে কোনো মানুষের ওপর জুলুম করতে পারে না। সে খুব ভালো করে জানে দুনিয়ার ক্ষমতার দাপট বা চেয়ার সাময়িক, কিন্তু কবরের আজাব চিরস্থায়ী। ফলে এই চিন্তার কারণে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ওজনে কম না দিয়ে সৎ হয়ে যায়, একজন চাকরিজীবী ফাইল আটকে ঘুষ না খেয়ে নিষ্ঠাবান হয় এবং সমাজের মানুষ একে অপরের বিপদে হিংসা ভুলে এগিয়ে আসে। এই পরকালভীতিই মূলত একটি সমাজকে বাহির থেকে নয়, বরং ভেতরের দিক থেকে পবিত্র, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলে।

বাহ্যিক আইন মানুষকে কেবল লোকচক্ষুর আড়ালে অপরাধ করা থেকে আটকাতে পারে, কিন্তু পরকালের ভয় মানুষকে একাকী অন্ধকারেও পাপ কাজ থেকে দূরে রাখে।

দীর্ঘ এই থিসিস বা গবেষণার পাতায় আমরা কবরের জীবন এবং 'বারযাখী' জগতের যে গভীর ও বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু কেবল কিছু তাত্ত্বিক তথ্য জানা কিংবা খাতার পাতা পূর্ণ করা নয়। বরং এর আসল উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার চাকচিক্যে ডুবে থাকা আমাদের ঘুমন্ত আত্মাকে অন্ধ মোহ থেকে জাগিয়ে তোলা। এই দীর্ঘ আলোচনার মূল সার নির্যাস হলো—মৃত্যু আমাদের জীবনের শেষ স্টেশন বা সবকিছুর সমাপ্তি নয়; বরং এটি হলো অনন্ত ও চিরস্থায়ী পরকালের মহাসফরের সর্বপ্রথম প্রবেশদ্বার মাত্র। আমরা দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকতে যত বড় ডিগ্রিই অর্জন করি না কেন, যত কোটি টাকার বা ধন-সম্পদের মালিকই হই না কেন,যত বেশিই জনপ্রিয়তা অর্জন করি না কেনো—আমাদের আসল আসল পরিচয় এবং ভালো-মন্দের হিসাব নির্ধারিত হবে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচের সেই অন্ধকার ঘরে, আমাদের রেখে যাওয়া আমলের মাধ্যমে।

এই দীর্ঘ গবেষণার প্রধান এবং চোখ খুলে দেওয়ার মতো সারকথাগুলোকে আমরা ৩টি পয়েন্টে সংক্ষেপে এভাবে হৃদয়ে গেঁথে নিতে পারি:

প্রথমত: মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে কখনো সমাজবিমুখ, অলস কিংবা দুনিয়াবিমুখ করে তোলে না। বরং এটি মানুষের ভেতরের অলসতা ভেঙে নেক আমল বা ভালো কাজ করার গতিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং দুনিয়াকে সুন্দরভাবে সাজাতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত: সদকায়ে জারিয়া (চলমান দান) এবং মৃত্যুর আগে সুন্দর একটি অসিয়ত লিখে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের মৃত্যুর পরও কবরের জীবনে সওয়াবের আলো পৌঁছানোর এক চমৎকার পারলৌকিক ফিক্সড ডিপোজিট তৈরি করে যেতে পারি।

তৃতীয়ত: মানুষের হক বা ঋণ এমন এক ভয়ানক ও জটিল বিষয়, যা দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পরিশোধ না করে গেলে পরকালের কোনো ধাপেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেওয়া শহীদেরও এই ঋণ বা মানুষের হক মাফ করা হয় না।

গবেষণার এই শেষ প্রান্তে এসে আমাদের মনের গভীরে একটি কথাই বারবার প্রতিধ্বনিত হয়—দুনিয়ার এই জীবনটি একটি ক্ষণস্থায়ী মোহের খেলা এবং ধোঁকার মরিচিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ আমরা বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছি, বেঁচে আছি; কিন্তু কাল হয়তো আমাদের নামটিও এই চেনা পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে। আমাদের আজকের দামী পোশাক কাল সাদা কাফনের কাপড়ে বদলে যাবে, আর আজকের আলিশান সাজানো বাড়ি কাল মাটির অন্ধকার কবরে রূপ নেবে।

তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই, মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত আজরাইল (আ.) আমাদের দরজায় কড়া নাড়ার আগেই—আমাদের জীবনের খাতাটি খাঁটি তাওবা আর নেক আমল দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে নেওয়া।

আসুন, আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে সংসারের ব্যস্ততার মাঝেও অন্তত কিছুটা সময় হলেও নিজের মৃত্যুর কথা মনে করি, মানুষের পাওনা ও হক আদায় করি এবং পরকালের খাঁটি পুঁজি জমা করি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার এই ক্ষুদ্র থিসিস বা গবেষণার কাজটিকে উত্তমভাবে কবুল করুন। আমাদের সবার মনের ভেতর কবরের আসল জবাবদিহিতার ভয় জাগ্রত করে দিন এবং আমাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাত—উভয় জগতেই চূড়ান্ত সফলতা ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন।

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
অনুবাদ: "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতেও কল্যাণ ও মঙ্গল দান করুন এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদের কবরের ও জাহান্নামের কঠিন আজাব থেকে রক্ষা করুন।"
আমীন, ছুম্মা আমীন।